সমরেশ মজুমদার

তনু অতনু সংবাদ

প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪১২

— সত্তর টাকা —

TANU ATANU SAMBAD
By
Samaresh Majumder
A Bengali novel published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.,
10 Shyama Charan De Street, Kolkata 700 073

মূল্য ঃ ১০০ টাকা

ISBN : 81-7293-885-3

শব্দগ্রন্থন
টেক্‌নোগ্রাফ, ১/৯৮ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রগ্রেসিভ আর্ট কনসার্ণ, ১৫৯/১এ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১২ হইতে অনিল হরি কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীযুক্তা অর্চনা রায়কে

সশ্রদ্ধায়

সমরেশ

ডুডুয়া একটি নদীর নাম। পাহাড়ি ঝরনাগুলো মিলে মিশে সমতলে পৌঁছে নদীর চেহারা নেয়, এ নদীও নিয়েছিল। নিয়ে মাইল তিরিশেক গিয়ে সব জল ঢেলেছে জলঢাকার পেটে। অতএব নদীর দৈর্ঘ্য বেশি নয়। তবে এর জল শীত গ্রীষ্মে কমে গেলেও একেবারে শুকোয় না। তখন বেশ শান্ত বালিকার মতো তিরতিরিয়ে বয়ে যায়। ওইটুকু যাওয়ার পথে তাকে একবারই মাথার ওপর সেতুকে মেনে নিতে হয়েছে। কারণ ন্যাশনাল হাইওয়ে ওখান দিয়ে চলে গেছে আসামে। নদীর নাম বহুকাল আগে কেউ দিয়েছিল ডুডুয়া। তাই ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে বছর আশি আগে যে জনপদ গড়ে উঠেছিল তার নামকরণ হয়েছিল নদীর নামে; ডুডুয়া।

জনপদ, তবে সেখানকার মানুষের সংখ্যা মেরে কেটে হাজার তিনেক। একটা পোস্ট-অফিস, ব্লক অফিস, কয়েকটা মুদির দোকান, একটা প্রাইমারি স্কুল ছাড়া কয়েক বছর হল সরকারি চিকিৎসালয় তৈরি হয়েছে এখানে। একটা ভাটিখানাও গজিয়ে উঠেছে গ্রামের শেষপ্রান্তে জঙ্গলের গায়ে।

জঙ্গল কেটে বসতি। আর কে না জানে এসব সম্ভব হয়েছে একটা লোকের জন্যে। সতীশ রায়। কিন্তু ওর কথা বলতে গেলেই লোকে বলে ডুডুয়ার সতীশ রায়। এই জায়গার নাম, নদীর নাম আর মানুষটির নাম একসঙ্গে জুড়ে গেছে। ডুডুয়ার একমাত্র কাঠচেরাই-এর কারখানার মালিক সতীশ রায়ের বয়স এখন বাহান্ন। বছর পনেরো আগে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ওঁর স্ত্রী মারা যান। তাঁকে জলপাইগুড়ির হাসপাতালে ভর্তি করিয়েও বাঁচাতে পারেননি তিনি। ডাক্তাররা বলেছিল, বড্ড দেরি করে নিয়ে এসেছেন। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়ে গেছে। একমাত্র ছেলে সত্য তখন সাত বছরের। স্ত্রীর চলে যাওয়ার আঘাত সতীশ রায় মুখ বুজে সহ্য করেছিলেন শুধু ছেলের দিকে তাকিয়ে। আত্মীয়স্বজন, স্তাবকেরা বলেছিল আবার বিয়ে করতে। অন্তত ছেলেকে মানুষ করার জন্যে আর একজন মহিলার প্রয়োজন। কানে তোলেননি সতীশ রায়। বাড়ির পুরোনো কাজের মহিলা মতির মাকে ডেকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সত্যর দেখাশোনা করার। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর আড়াই বছরের মধ্যে অনেক লেখালেখি, তদ্বির করে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলিয়ে ছিলেন ডুডুয়াতে। যাতে ম্যালেরিয়া হলেই ঠিকঠাক ওষুধ এলাকার মানুষ পায় সেই চেষ্টা করেছেন। নদীতে মশা জন্মায় খুব কম। মশার ডিম তো মাছেরাই

খেয়ে ফেলে। সতীশ রায়ের উদ্যোগে ডুডুয়া গ্রামের কোথাও কোন ভাঙা পাত্রে, গর্তে জল জমে যাতে মশা ডিম না পাড়তে পারে তার ব্যবস্থা হয়েছে।

এই ডুডুয়া গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ কৃষিজীবী। হাইওয়ের এপাশে গ্রাম, ওপাশে চাষের জমি। আর কিছু মানুষ কাঠের কারখানায় কাজ করে। এছাড়া পোস্ট অফিস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র অথবা দোকানগুলোর কর্মচারীরা আছে। কিন্তু সবাই জানে, বিপদে আপদে মাথার ওপর সতীশ রায় আছেন। ডুডুয়ার সতীশ রায়কে চেনে না এমন লোক জেলার এই তল্লাটে নেই।

স্ত্রীর চলে যাওয়ার পর একটি অভ্যেসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন সতীশ রায়। সন্ধের মুখে তাঁর দুই স্তাবক চলে আসেন। সতীশেরই সমান বয়সি। একজন গোরক্ষনাথ, অন্যজন নাগেশ্বর। দুজনেই খুব শীর্ণ চেহারার, বেঁটে। কিন্তু দুজনের মুখের হাসি কখনই বন্ধ হয় না। এঁরা নিঃশব্দে হাসতে জানেন।

গোধূলির একটু পরেই ওরা চলে এল। গোরক্ষনাথ আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল, 'আমি বলছি, আজ বৃষ্টি হবে না। কাল পূর্ণিমা বলে কথা।'

নাগেশ্বর মাথা নাড়ল, 'ঠিক হল না। কথাটা হবে, পূর্ণিমার আগের দিন বৃষ্টি হয় না। চক্ষুলজ্জা বলে তো একটা কথা আছে।'

নদীর গায়ে বাগান। বাগানের শেষে বাড়ি। সতীশ রায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগানে এসে দাঁড়ালেন। পরনে পাঞ্জাবি আর পাজামা। হাতে বার্মা চুরুট। দুই স্তাবকের দিকে তাকিয়ে ভ্রু কোঁচকালেন, 'নাগেশ্বর, আজ দুপুরে কিছু খাওনি?'

হাত কচলাল নাগেশ্বর, 'একেই বলে দিব্যদৃষ্টি। দেখলে গোরক্ষনাথ, ঠিক ধরে ফেলেছেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদ না থাকলে এরকম হয় না।'

গোরক্ষনাথ বলল, 'আজ ওর স্ত্রীর মঙ্গলচণ্ডীর উপোস।'

'তাই বলো। তাই তোমাকে রোগা দেখাচ্ছে।' সতীশ রায় বললেন, 'তা আজ কোথায় আসন পাতবে?'

গোরক্ষনাথ বলল, 'বলছিলাম কী, আজ বৃষ্টি হবে না। ভালো বাতাসও বইছে। নদীর ধারে টেবিল চেয়ার পেতে বসলে কেমন হয়।'

'একটু বাদেই চাঁদ উঠবে। আপনি তো জ্যোৎস্না খুব পছন্দ করেন।' নাগেশ্বর সবিনয়ে মনে করিয়ে দিল।

'করতাম। পনেরো বছর আগে। যাকগে।' সতীশ রায় গলা তুলে ডাকলেন, 'হরিপদ, হরিপদ!'

সঙ্গে সঙ্গে একজন প্রৌঢ় কাজের লোক সামনে এসে দাঁড়াল।

সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'খোকা কোথায়?'

'তার ঘরে।' হরিপদ জবাব দিল।

'কী করছে এখন?'

'আজ্ঞে, লেখালেখি করছে।'

'লেখালেখি? কী লেখে?'

'তা জানি না। লেখে আর কাটে। নিজের মনেই থাকে।'

'হুঁ। মতির মাকে বলো কী লেখে তা জিজ্ঞাসা করতে। আর হ্যাঁ, নদীর ধারে টেবিল আর চারটে চেয়ার লাগাও। জলদি।' সতীশ রায় এগিয়ে গিয়ে ডুডুয়ার পাড়ে দাঁড়ালেন। মনে হল, ওখানে বসলে জল, আকাশ এবং জলে আকাশ সবই দেখা যাবে।

গোরক্ষনাথ বলল, 'আজ একটা চেয়ার বেশি বললেন?'

'ভয় নেই। তাতে তোমাদের ভাগ কম হবে না।' বলতে বলতে জলে মাছের ঘাই-এর শব্দ শুনতে পেলেন সতীশ রায়। তাঁর মুখে হাসি ফুটল। বললেন, 'দ্যাখো, কাজ হয়েছে। বলেছিলাম বছরে ছয়মাস কেউ নদীতে ছিপ বা জাল ফেলবে না। লোকে কথা শুনেছে বলেই মাছগুলো গায়ে গতরে বেড়েছে।'

নাগেশ্বর বলল, 'কার ঘাড়ে কটা মাথা যে আপনার কথা শুনবে না।'

হরিপদ টেবিল চেয়ার এনে সাজিয়ে দিল। দুটো বোতল এল। একটা দামি হুইস্কি অন্যটা অতি সাধারণ। সতীশ রায়ের জন্যে কাজুবাদাম আর ওদের জন্যে চিনে বাদাম। সতীশ রায়ের জন্যে ফোটানো জল আর বরফ, অন্যদের জন্যে কুয়োর জল। সতীশ রায় বসলেন সেই চেয়ারে যেখানে বসলে চাঁদের মুখ দেখতে পাবেন। অন্য দু-জন তাঁর উলটো দিকে। হরিপদ পরিবেশন করে চলে গেল।

'চীয়ার্স।' সতীশ রায় গ্লাসে ঠোঁট রাখলেন।

'চীয়ার্স, চীয়ার্স।' দু-জন বলতেই জলে ভালো শব্দ হল। প্রথম ঢোঁক গিলে সতীশ রায় বললেন, 'কাতলা। দেড় কেজি ওজন। পেটে ডিম নেই।'

গোরক্ষনাথ বলল, 'তার মানে পেট পাতলা হয়নি। আহা।'

সতীশ রায় বললেন, 'আমার এই ডুডুয়ায় কত রকমের মাছ আছে জানো? আমি তো আট রকমের খোঁজ পেয়েছি। রুই, কাতলা, পারশে, ট্যাংরা, খলসে, পুঁটি, বান, শোল।'

নাগেশ্বর মাথা নাড়ল, 'আর একটা মাছ নদীতে এলে যোলকলা পূর্ণ হত।'

গোরক্ষনাথ মুখ তুলল, 'ভেটকি?'

'দূর!' নাগেশ্বর সতীশ রায়ের দিকে তাকাল, 'ইলিশ ডুডুয়ায় পেলে কী ভালো হত।'

গোরক্ষনাথ হাসল। তার টাক মাথার চামড়ায় ঢেউ খেলে গেল। 'শুনলেন বড়বাবু? ডুডুয়াতে ইলিশ এলে ছিপে ধরবেন নাগেশ্বর। আরে ইলিশ হল সমুদ্রের মাছ। এ কথা তো বাচ্চারাও জানে। নদীতে পাওয়া যাবে কী করে?'

খুব রেগে গেল নাগেশ্বর, 'নাঃ! সঙ্গ ত্যাগ না করলে চরিত্র নিম্নমুখী হয়। বড়বাবু স্নেহ করেন বলে না এসে পারি না। আচ্ছা, গঙ্গা, পদ্মা, রূপনারায়ণ এরা কী নদী নয়? এদের জলে কি ইলিশ পাওয়া যায় না?'

সতীশ রায়ের মজা লাগছিল। বললেন, 'ঠিক কথা। তবে ওসব নদীতে ইলিশ ঢুকে পড়ে সমুদ্র থেকে ডিম পাড়তে। তখনই ধরা পড়ে।'

'সেকথাই তো বলছি। গঙ্গায় যেমন ঢোকে ডুডুয়াতেও যদি ঢুকত?'

গোরক্ষনাথ বলল, 'ঢুকবে কী করে? ডুডুয়া গিয়ে মিশেছে জলঢাকায়। জলঢাকা পড়েছে তোর্ষায়, তোর্ষা ব্রহ্মপুত্রে, ব্রহ্মপুত্র সমুদ্রে। ব্রহ্মপুত্রে ইলিশ ঢোকে।'

'সেকথাই তো বলছি। ইলিশগুলো তো নদী বেয়ে বেয়ে এখানে চলে আসতে পারত। কি বড়বাবু, পারত না?' নাগেশ্বর তাকাল।

সতীশ রায় মুখ তুললেন, সঙ্গে সঙ্গে দূরের গাছগাছালির ওপর প্রায়-গোল একটা আলোর বল লাফিয়ে উঠে বসল। মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। এখনই চরাচর জ্যোৎস্নায় ছেয়ে যাবে। চাঁদের শরীরের কলঙ্ক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তিনি বললেন, 'মন ভালো হয়ে গেল।' তিনি গ্লাসে বড় চুমুক দিলেন।

'আজ্ঞে, ইলিশের কথা উঠলে আমারও মন ভালো হয়ে যায়।'

'তাহলে তুমি পেছনে তাকিয়ো না।'

'পেছনে? কী আছে পেছনে?' নাগেশ্বর তাকাতে গিয়েও তাকাল না।

'চাঁদ উঠেছে। বিশাল চাঁদ। আহা, চক্ষু সার্থক হল।'

'এই কথা! চাঁদের মুখে সূর্যের আলো পড়েছে বলেই চাঁদ সুন্দর। আবার সেই চাঁদের আলো আপনার মুখে পড়ায় আমি ধন্য হয়ে গিয়েছি।'

'কেন?' সতীশ রায় চোখ ছোট করলেন।

'আপনাকে এখন পরমসুন্দর দেখাচ্ছে।'

সতীশ রায় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হরিপদকে আসতে দেখে থমকে গেলেন। হরিপদ কাছে এসে নিচু গলায় বলল, 'তরুণ সংঘের ছেলেরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কাল আসতে বলব?'

গোরক্ষনাথ বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তাই বলো। এখন বড়বাবুকে বিরক্ত কেন করবে?'

সতীশ রায় উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি যাচ্ছি।'

বাগানের ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্নায় হাঁটতে অসুবিধে হল না। গেটের ওপাশে ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে। কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়স। তরুণ সংঘ নাম দিয়ে ক্লাব করেছে। আশেপাশের গঞ্জে ফুটবল খেলে বেড়ায়। সতীশ রায় প্রেসিডেন্ট। প্রতিবছর বল কিনে দিতে হয়, খেলতে যাওয়ার সময় গাড়ি ভাড়াও তাঁকেই জোগাতে হয়। ছেলেগুলো বেকার। চাষের সময় বাপ কাকাকে সাহায্য করতে মাঠে যায় বটে, বাকি সময়টা নিষ্কর্মা হয়ে থাকে।

'হ্যাঁ। বলো, কী ব্যাপার?' সতীশ রায় গেটের সামনে চলে এলেন।

'পরশু খেলা আছে। বানারহাটের সঙ্গে। যেতে হবে।' একজন বলল।

'নিশ্চয়ই যাবো। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।' সতীশ রায় বললেন।

ওরা নিজেদের দিকে তাকাল। একজন বলল, 'কেউ কি কোনও অন্যায় করেছে।'

'না না, এক কাজ করো। আমি কাল সকাল সাড়ে নটায় বেরুব। তোমরা ঠিক নটায় এখানে চলে আসবে। তোমাদের ক্যাপ্টেন কে?'

'এক এক ম্যাচে এক একজন হয়।'

'হুঁ, কিন্তু কাল আসার আগে একজনকে নেতা ঠিক করে আসবে। যাও।'

ওরা চলে গেলে ফিরে এসে তিনি দেখলেন দু-জনেই গ্লাস ভরে নিয়েছে। তাঁকে বলতে হল না, ওরাই তাঁর গ্লাস ভরে দিতেই পাশের নদীর জলে আবার ঘাই মারল মাছ।

'খেলতে যাবে বুঝি?' নাগেশ্বর জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, তবে কাল ওদের আসতে বলেছি অন্য কারণে। এই ছেলেগুলোকে একটা রোজগারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চাই।' সতীশ রায় বললেন।

'কী রকম?'

'ডুডুয়ায় এখন প্রচুর মাছ। আওয়াজ তো শুনছ। তরুণ সংঘের ছেলেরা

ছয় মাস ধরে এই মাছ ধরবে। ধরে হাটে গিয়ে মাছওয়ালাদের কাছে বিক্রি করবে। খরচ বাদ দিয়ে যা লাভ হবে তা নিজেরা সমান ভাগ করে নেবে। যে ছয়মাস মাছ ধরা হবে না সেই ছয়মাস ওরাই নদী পাহারা দেবে। কী? আইডিয়াটা কেমন লাগছে?' সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'অপূর্ব। চমৎকার। অবস্থা ফিরে যাবে ওদের।' গোরক্ষনাথ বলল।

'একটা কথা। শুধু ছেলে কেন, মেয়েদেরও যদি জুড়ে দিতেন।' নাগেশ্বর বলতে বলতে আড়চোখে গোরক্ষনাথকে দেখল।

গোরক্ষনাথ ফিক ফিক করে হাসি শুরু করেছে।

নাগেশ্বর হজম করল। গোরক্ষর মেয়ে নেই। সংসারে আইবুড়ো মেয়ে বসে থাকলে যে জ্বালা বাবার মনে ধরে তা ও কী করে বুঝবে।

'মাস্টারনি থেকে অছো, ভাবাটাই অন্যায়।' গোরক্ষ বলল।

'কার কথা বলছ?' সতীশ রায় তাকালেন।

'আজ্ঞে নাগেশ্বরের মেয়ে। আপনি বলে দেওয়ায় সে পাঠশালার মাস্টারের কাছে পড়ানো শিখেছে। মাস্টারের চাকরি তো এই চৈত্রেই শেষ হবে। তারপর পাঠশালার যে কী হাল হবে!' গোরক্ষ হতাশ।

'কেন? আমার মেয়ে কি খারাপ পড়াচ্ছে? মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি তো একটাও কুকথা বললেন না। তবে পোস্ট-অফিসের অবস্থা খুব খারাপ।' কথা ঘোরাল নাগেশ্বর।

'কেন?' দ্বিতীয় গ্লাস শেষ করলেন সতীশ রায়। এটাই তাঁর কোটা। কালেভদ্রে তৃতীয় গ্লাস চলতে পারে, রোজ কখনই নয়। মদ আর মস্তিষ্ক কখনই বন্ধু হতে পারে না। যতক্ষণ মদকে মস্তিষ্ক দাবিয়ে রাখতে পারে ততক্ষণ পান করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

'পোস্টমাস্টার ফ্যামিলি নিয়ে কলকাতায় গিয়েছে। ব্যাস, কর্মচারীদের পোয়াবারো। ঠিক সময়ে পোস্ট-অফিস খুলল না, খুললেও ডিউটিতে থাকছে না।' নাগেশ্বর জানাল।

এই সময় হরিপদ কাছে এসে দাঁড়াল, 'এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান।'

'কে?' সতীশ রায় সোজা হয়ে বসলেন।

'বললেন উনি ঘটকমশাই।' হরিপদ বলল।

নাগেশ্বর হাসল, 'তুমি এই খবর দিতে এলে হরিপদ! বড়বাবুর যদি ইচ্ছে থাকত তাহলে কয়েক বছর আগেই বিয়ে করতে পারত। কাটিয়ে দাও।'

'আঃ! বড্ড বেশি কথা বলো তুমি!' ধমকালেন সতীশ রায়। তারপর মাথা নাড়লেন, 'নিয়ে এসো এখানে।'

হরিপদ চলে গেল।

গোরক্ষ বলল, 'কথাই আছে, যে বেশি বকে সে বাজে কথা বলে।'

হরিপদ যাকে নিয়ে এল তার বয়স ষাট পেরিয়েছে। পরনে ধুতি আর বাবু শার্ট। কাঁধে কাপড়ের ঝোলা। সামনে এসে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে ঝুঁকে নমস্কার জানিয়ে টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন। 'এ হে হে, বড় অসময়ে এসে পড়লাম।'

সতীশ রায় বললেন, 'বসো।'

'বসব? আপনাদের এখন সেবার সময়।'

'শোনো ঘটকবাবু, ন্যাকামি আমি সহ্য করতে পারি না।'

চেয়ার টেনে দ্রুত বসে পড়লেন ঘটকবাবু। বসে তাকালেন দুজনের দিকে।

গোরক্ষ বলল, 'আমি গোরক্ষ, ইনি নাগেশ্বর। বড়বাবুর স্নেহধন্য।'

'আমার দুই সাপ। তবে বিষ নেই। ঢোঁড়া বা হেলে বলতে পারো।' সতীশ রায় হাসলেন, 'তা, এখন কটা বাজে?'

'আজ্ঞে সাতটা।' নাগেশ্বর বলল।

'তোমার শেষ বাস কখন?'

'এখান দিয়ে সাড়ে সাতটায় যায়।' ঘটকবাবু বললেন।

'তাহলে একদম সময় নেই। এক গ্লাস চলবে?'

'না না।' শরীর নাড়ালেন ঘটকবাবু, 'সন্ধান পেয়েছি বড়বাবু।'

'বাঃ! গুড। বাড়ি কোথায়?'

'আলিপুরদুয়ারের কাছে।'

'বয়স?'

'আজ্ঞে বলছে কুড়ি। দু-বছর জল মেশালে বাইশ ধরতে পারেন।

'চলবে। বৃত্তান্ত বলো।'

'পরমাসুন্দরী, যেমন নাক, তেমন চোখ, তেমন গড়ন, গায়ের রঙ ওই জ্যোৎস্নার চেয়েও সুন্দর। মানে যাকে বলে—।'

'আঃ! অন্য গুণ বলো!'

'হ্যাঁ। গৃহকর্মনিপুণা, রন্ধনে দ্রৌপদী, সূচিশিল্পে দক্ষ, মৃদুভাষিণী, এরকম পাত্রী ভূভারতে পাওয়া যাবে না।'

'তুমি ওঠো!' সতীশ রায় গম্ভীর গলায় বললেন।

'অ্যাঁ?' চমকে উঠলেন ঘটকবাবু।

'তোমাকে সেদিন বলেছিলাম আমার প্রতিমার দরকার নেই।'

'তাহলে?'

'কান খুলে শোনো, আমার ছেলে সত্যচরণের জন্যে আমি একটি সুশ্রী পাত্রী চাই, যার দিকে তাকালে মন বিরূপ হবে না। ডানাকাটা সুন্দরীর কোনও দরকার নেই। কিন্তু আমার একটাই শর্ত আছে।' মাথা নাড়লেন সতীশ রায়।

'আদেশ করুন।' ঝোলা থেকে খাতা বের করলেন ঘটকমশাই।

'সেই মেয়ের স্বভাবে একটু নষ্টামির ঝোঁক থাকতে হবে।'

'সেকি!' আঁতকে উঠলেন ঘটকমশাই।

'আর দেরি করলে বাস পাবে না।'

'কিন্তু, কোনও বাপ বলবে যে তার মেয়ের স্বভাবে নষ্টামি আছে?' ঘটকমশাই খাতা ব্যাগে ঢোকালেন।

'ওঃ! আমি নষ্টামি বলিনি। বলেছি নষ্টামির ঝোঁক। বোঝনি?'

'না।'

'বাতাস জোরে বইলে কী বলি আমরা?'

'আজ্ঞে ঝড়।'

'যদি খুব ধীরে বয়?'

'মধুর হাওয়া।'

'ঠিক তাই।'

'কিন্তু বড়বাবু, কোনও বাপ স্বীকার করবে না।'

'বাপ না করুক মা করবে।' সতীশ রায় বললেন।

'মা না করুক প্রতিবেশিরা করবে।' নাগেশ্বর বলল।

উঠে দাঁড়ালেন ঘটকমশাই। তাঁর মুখ চুপসে গিয়েছে।

'আচ্ছা, চলি।'

ঘটকমশাই চলে গেলে গোরক্ষ বলল, 'আহা, বেচারির মুখ দেখে মনে হল পাঁচ কেজি মাছ বড়শি থেকে ছিটকে গেল।'

নাগেশ্বরের গলা জড়িয়ে এল, 'বড়বাবু।'

সতীশ রায় উঠে দাঁড়ালেন, 'আমার খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে।'

'একটা কথা!' নাগেশ্বর উঠে দাঁড়াতে পা টলল।

'চটপট বলো। মাতালদের অসহ্য লাগে আমার।'

'খোকার জন্য ওরকম পাত্রী চাইছেন কেন?' নাগেশ্বর জিজ্ঞাসা করল।

সতীশ রায় একটা আঙুল তুললেন, 'এভাবে সোজা করে আঙুল বোতলে ঢোকালে ঘি উঠবে? তার জন্যে আঙুলটা একটু বাঁকাতে হয়।' বাড়ির দিকে চলে গেলেন সতীশ রায়।

হরিপদ প্রায় লাফিয়ে এল সামনে, 'বাড়ি যান।'

'এখনও গ্লাসে রয়েছে যে—।' গোরক্ষ বলল।

গ্লাসের তরল পদার্থ ঘাসের ওপর ফেলে দিয়ে হরিপদ বলল, 'আর নেই, বাবুকে খেতে দিতে হবে, দেরি করিয়ে দেবেন না।'

জ্যোৎস্নায় গোরক্ষ আর নাগেশ্বর বাড়ির দিকে পা বাড়াল হাত ধরাধরি করে।

ভোর ভোর সময়টায় ঘুম ভেঙে যায় ডুডুয়ার সতীশ রায়ের। মুখ ধুয়ে তিনি চলে আসেন বাগানের এপাশে, ডুডুয়া নদীর ধারে। বড়সড় নদী নয়, তবু এই কালো ছায়ামাখা নদীর দিকে তাকালে মন ভরে যায়। সতীশ রায়ের পিতৃদেবের ইচ্ছেয় জায়গার নাম ডুডুয়া হয়েছে বলে কথিত আছে। তখনও এখানে ধানের চাষ হত, এপাশে ছিল জঙ্গল। ধূপগুড়ির উপকণ্ঠে বাড়ি ছিল তাদের। যাতায়াতে অসুবিধে হত, জায়গাতেও কুলোচ্ছিল না, তাই বন কেটে জমির গায়ে বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। লোকে বলে তাঁদের পরিবারের জন্যেই এখানকার সবাই ভাল আছে। বাবার কাছে শুনেছেন সতীশ রায়, পাকিস্তান হওয়ার পর পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা উদ্বাস্তুদের বেশ বড় দুটো দল এখানেও আশ্রয় নিয়েছে। তখন নিজেদের সংখ্যা কম হওয়ায় তাঁরা সাগ্রহে ওদের সাহায্য করেছেন। বেশির ভাগই জলপাইগুড়ি-কুচবিহার সীমান্তের ওপারের মানুষ। ভাষা, সংস্কৃতিতে কোনও পার্থক্য না থাকায় মিশে যেতে অসুবিধে হয়নি। এখন আর ডুডুয়াতে খালি জমি নেই। যা আছে তা সরকারি খাস জমি অথবা বনবিভাগের সম্পত্তি। ভালই হয়েছে তাতে, জনসংখ্যা আর না বাড়াই ভালো।

একটা ছিপ নৌকো দেখতে পেলেন সতীশ রায়। চিৎকার করলেন, 'কে যায়?'

'আজ্ঞে আমি তারিণী।' লগি নৌকোয় তুলে হাতজোড় করল লোকটা।

'ও। তা এই সাতসকালে চললে কোথায়? মাছ ধরতে নাকি?'

'ছি ছি ছি। আপনি নিষেধ করেছেন, অমান্য করতে পারি?'

'তোমার ছেলে তরুণ সংঘে খেলে, তাই তো?'

'আর বলবেন না। এক পয়সা রোজগার নেই, শুধু খেলা আর খেলা। বড়বাবু ওর একটা ব্যবস্থা করে দিন না।' তারিণী কাতর গলায় বলল।

'হবে, শিগ্‌গির হবে। তা তুমি নদীতে কী করছ?'

'মেয়ের বাড়ি যাচ্ছি। নাঁতির শরীর খারাপ খবর এসেছে।'

'মেয়ের বাড়ি কোথায়?'

'জোড়াপানিতে, বাসে গেলে দুবার পালটাতে হয়, পয়সাও লাগে। নদী বেয়ে গেলে এক ঘণ্টায় পৌঁছে যাব মাগনায়। নদীর পাশেই বাড়ি।'

'বাঃ! বেশ ভালো। যাও।'

তারিণীর ছিপ নৌকো অদৃশ্য হওয়ামাত্র একটা কাতলা মাছ লাফিয়ে জলের ওপর উঠেই নেমে গেল। এক লহমায় তার চকচকে শরীর দেখতে পেয়ে খুব খুশি হলেন সতীশ রায়। বেশ ভালো স্বাস্থ্য মাছটার।

তখনই তাঁর মাথায় বুদ্ধিটা এল। এই যে ছেলেগুলো খেলা-পাগল, খেলেই চলেছে কিন্তু কী করে ভালো খেলতে হয় তা শেখানোর কোনও লোক নেই। নিজেরাই যা পারছে খেলছে। শহর থেকে কোচ আনলে কী রকম খরচ পড়ে? জলপাইগুড়ির টাউন ক্লাবের অবনীদার সঙ্গে তাঁর এককালে পরিচয় ছিল। ওঁকে জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়? আজ শহরে যেতে হবে ডিসি অফিসে। তখন যদি সময় পান তাহলে অবনীদার সঙ্গে দেখা করবেন।

সকাল নটায় ভাত খেয়ে নিলেন সতীশ রায়। খাওয়া শেষ হতে মতির মাকে ডেকে পাঠালেন। বৃদ্ধা এসে দরজার পাশে দাঁড়াল মাথায় ঘোমটা দিয়ে। চেয়ারে বসে পান চিবোচ্ছিলেন সতীশ রায়। জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন এই বাড়িতে কে রাঁধছে মতির মা?'

'আজ্ঞে আমি।'

'লোক দ্যাখো। ভালো রান্না জানা এমন কাউকে আনো। যত বয়স হচ্ছে তোমার হাতের রান্না তত খারাপ হচ্ছে। রান্নায় যে ঝাল দিতে হয় তাও ভুলে গেছ।'

'খোকা ঝাল একদম খেতে পারে না। কষ্ট হয়।' মতির মা বলল।

মাথা নাড়লেন সতীশ রায়। তারপর বললেন, 'তোমার ওই খোকার রান্না তুমি রেঁধো, আমার জন্যে ভালো রাঁধুনি খুঁজে আনো।' কথাটা বলেই খেয়াল হল

তাঁর, 'সত্যকে এখানে আসতে বলো।'

মতির মা যেন আঁতকে উঠল, 'ওকে বকবেন না বড়বাবু।'

'বকব? আমি তাকে বকবো বলে কেন মনে হল! যত্ত সব! যাও, পাঠিয়ে দাও।'

মতির মা চলে গেল। সিগারেট শেষ করলেন তিনি। সারাদিনে এক প্যাকেট সিগারেট, সন্ধের পর একটা দামি চুরুট। ডাক্তাররা বলে নেশাটা খারাপ, কিন্তু কিছু করার নেই। সতার মা বলত, 'তুমি সিগারেট খেলে গন্ধটা বেশ লাগে, কিন্তু চুরুটের গন্ধ সহ্য করতে পারি না।' তখন সন্ধের পরে মদ্যপান করতেন না, তাই চুরুট খাওয়া বন্ধ রেখেছিলেন। হঠাৎ দরজার দিকে তাকাতেই দেখলেন, সত্যচরণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

'তুমি ওখানে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন?' জিজ্ঞাসা করলেন সতীশ রায়।

'আপনি ডেকেছেন!' মাথা নিচু করে জবাব দিল সত্যচরণ।

'তাতে সাড়া দিয়ে তুমি এঘরে এসেছ সেটা জানান দেবে তো!'

সত্যচরণ কথা বলল না। মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'কি করছিলে?'

'পড়ছিলাম।'

'কী বই?'

'শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ।'

'পাও কোথায়?'

'হরিপদদা এনে দেয় লাইব্রেরি থেকে।'

'শোনো, অনেক হয়েছে। কাল থেকে তুমি আমার সঙ্গে বেরুবে। অনেক বয়স হয়েছে। ঘরে বসে বই পড়ে সময় নষ্ট করা চলবে না। আমার ব্যবসাগুলো কীভাবে চলছে শিখে নাও। কানে ঢুকল?' ছেলের দিকে তাকালেন সতীশ রায়।

'কাল থেকে যেতে বলবেন না।' মুখ তুলল না সত্যচরণ।

'কেন? কী রাজকাজ আছে তোমার?'

'এই মাসটায় আমি খুব কষ্টে থাকি।'

'কষ্টে থাকো? কেন?'

'এই মাসেই মা স্বর্গে গিয়েছিল।'

থমকে গেলেন সতীশ রায়। হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। তবে পনেরো বছর বাদে

ওটা মনে রাখার বিষয় নয়। এমন মাতৃভক্ত ছেলে যে অনেক বছর পরেও মায়ের মৃত্যুমাসে কষ্টে থাকে! ভাবা যায়?

'হুম্, ঠিক আছে। মনে রেখো আমার সঙ্গে ছলচাতুরি করে তুমি পার পাবে না। ও হ্যাঁ, শুনলাম ঘরে বসে তুমি নাকি কিছু লেখো আর কাটো। কী ব্যাপার?'

চুপ করে থাকল সত্যচরণ।

'দ্যাখো, তোমার কোনও বন্ধু নেই, কোথাও গল্প করতে যাও না। তরুণ সংঘের ছেলেরা খেলাধুলা করে, তাদের সঙ্গেও তোমার সম্পর্ক নেই, একদম ঘরকুনো হয়ে থাকলে চলবে? যাও।'

বলামাত্র সত্যচরণ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু হরিপদ এল, 'ক্লাবের ছেলেরা এসেছে দেখা করতে। বলল, আপনি আসতে বলেছেন।'

'হুঁ, শোনো হরিপদ। সত্য কী লেখে আর কাটে তা আমি দেখতে চাই।'

'আমাকে মতির মা খোকার ঘরে ঢুকতে দেয় না।'

'তাহলে তাকেই বলো একটা পাতা জোগাড় করে আনতে।'

'বলবো, এই একটু আগে খোকা একটা পাতা ছিঁড়ে পাকিয়ে মেঝেয় ফেলে দিতেই মতির মা সেটা যত্ন করে কুড়িয়ে নিয়েছে।'

'বাঃ, ওই পাতাটা মতির মায়ের কাছ থেকে নিয়ে এসো। আমার হুকুম।'

বাইরে বেরিয়ে এলেন সতীশ রায়।

ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে আছে বাগানে। একটু অস্বস্তিতে। এদের মধ্যে তারিণীর ছেলে কোন্‌টা? বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের দলে কজন আছে?'

'কুড়ি-জন।'

'কিন্তু এখানে তো বারোজনকে দেখতে পাচ্ছি।'

'বাকি আটজন বয়সে ছোট। ষোল সতেরো। তাই নিয়ে আসিনি।'

যে ছেলেটি কথা বলছিল তার দিকে তাকালেন। ওর নাম মঙ্গল। ব্যাক খেলে। ভালোই খেলে।

'তোমাদের জন্যে একটা পরিকল্পনা করেছি। তোমরা সবাই জানো গত ছয়মাস ধরে ডুডুয়া নদীর এই এলাকায় মাছ ধরা বন্ধ আছে। আগামী ছয়মাস মাছ ধরা যাবে এবং সেটা ধরবে তোমরা।' ঘোষণার ভঙ্গিতে বললেন সতীশ রায়।

গুঞ্জন উঠল।

সতীশ রায় বললেন, 'তার আগে তোমাদের একটা কো-অপারেটিভ তৈরি করতে হবে। এই বারোজন হবে সেই কো-অপারেটিভের মেম্বার। আমি গতরাতে বলে দিয়েছিলাম আজ এখানে আসার আগে একজনকে নেতা নির্বাচন করে আসবে। কাকে নির্বাচন করেছ?'

'মঙ্গলকে।' সবাই কথা বলল, একসঙ্গে।

'বেশ। মঙ্গল হবে কো-অপারেটিভের সেক্রেটারি। এই কো-অপারেটিভ ছাড়া আর কেউ ডুডুয়াতে মাছ ধরতে পারবে না। মাছ ধরতে যা যা লাগে সেসব খরচ আমার। এখান থেকে তিরিশ মাইলের মধ্যে সপ্তাহে চারটে হাট হয়। প্রতি ভোরে মাছ ধরবে, সকাল নটা পর্যন্ত। তারপর সেই মাছ হাটে নিয়ে গিয়ে মাছওয়ালাদের কাছে বিক্রি করে দেবে। খরচ বাদ দিয়ে যা লাভ থাকবে তার অর্ধেক ব্যাঙ্কে রাখবে কো-অপারেটিভের অ্যাকাউন্টে। বাকিটা বারোজন সমান ভাগ করে নেবে। এই ছয়মাসে যা রোজগার করবে তাতে তোমাদের পরিবারের বারোমাসের খরচ মেটাতে পারবে। ব্যাঙ্কে যা জমবে তার বারোভাগের একভাগ প্রত্যেকে আপদে বিপদে খরচ করতে পারবে।' ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বললেন সতীশ রায়।

ছেলেগুলোর মুখ চকচক করল। একজন বলল, 'কিন্তু আমরা কী দিয়ে মাছ ধরব? ছিপ দিয়ে?'

'ছিপ দিয়ে তিনচার ঘণ্টায় কটা মাছ ধরতে পারবে? জাল ফেলতে হবে। এটা শিখে নাও অন্য জায়গার জেলেদের কাছে। শিখতে চাইলে সব কিছু শেখা যায়। কো-অপারেটিভের নাম হবে 'ডুডুয়া ইয়ং মেন ফিশারিস'। সতীশ রায় বললেন, 'আমি আজ শহরে যাচ্ছি। কত তাড়াতাড়ি কো-অপারেটিভ তৈরি করা যায় খবরাখবর নেব। তোমরা ময়নাগুড়িতে গিয়ে দাশরথি উকিলের সঙ্গে দেখা করে আমার কথা বলবে। তিনি কাগজপত্র তৈরি করে দেবেন।'

মঙ্গল বলল, 'রোজ কত মাছ ধরব?'

'রোজ নয়, সপ্তাহে চারদিন। চারদিনের ভোর থেকে চার ঘণ্টায় যা ওঠে। তার বেশি নয়। আর হ্যাঁ। এখন মাছ বেশ বড় হয়ে গেছে। তোমাদের লক্ষ রাখতে হবে যেন চুরি করে কেউ মাছ না ধরে।'

'তাহলে কি তরুণ সংঘ উঠে যাবে?' একজন জিজ্ঞাসা করল।

'মূর্খের মতো কথা বলছ! ছয়মাস সপ্তাহে চারদিনের অর্ধেক বেলা। তারপর কী করবে? তরুণ সংঘ থাকবে। ভালোভাবে থাকবে। আর বাকি ছয়মাস

তো তোমরা একদম বেকার। তখন তো আরও সময় পাবে। এ ব্যাপারেও আমি ভেবেছি। তোমরা এখন ফুটবল খেলো নিজেদের মতো করে। কিন্তু ভালো খেলতে হলে একজন কোচ দরকার। এই কোচ তোমাদের ঠিকঠাক খেলা শেখাবেন।'

সতীশ রায়ের কথায় হাসি ফুটল প্রত্যেকটা মুখে। সতীশ রায় লক্ষ করলেন মাছ ধরার প্রস্তাবেও এই হাসি ওদের মুখে দেখা যায়নি।

পকেট থেকে আড়াইশো টাকা বের করে মঙ্গলের হাতে দিলেন তিনি, 'বানারহাটে খেলতে যাচ্ছ, জিতে ফিরতে হবে।'

'আমরা চেষ্টা করব।' মঙ্গল বলল।

ওরা ফিরে যেতে যেতে দাঁড়াল। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল নিচু গলায়। তারপর মঙ্গল ফিরে এল, 'কাকা, সত্যদাকে আমাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না।'

'কী ব্যাপারে?'

'ওই কো-অপারেটিভে।'

'তার সঙ্গে তোমাদের কথা হয়?'

'না।'

'তাকে দেখতে পাও?'

'না।'

'কো-অপারেটিভের প্রত্যেক সদস্যকে কাজ করতে হবে। অকাজের লোককে রেখে লাভ কী! তোমরা পরে এসে ওকে জিজ্ঞাসা কোরো সে কাজ করতে ইচ্ছুক কিনা।'

ছেলেরা চলে গেল।

দেরি হয়ে গিয়েছে বেশ। সতীশ রায় ঘরে এসে তৈরি হলেন। এই সময় মতির মা দরজায় এল, 'বাবু।'

'বলো।'

'খোকাবাবু তো নিজের মনে লেখে, ওকে কিছু বলবেন না।'

'কী লেখে?'

একটা দলা পাকানো কাগজ এগিয়ে দিল মতির মা।

সেটা নিয়ে খুললেন সতীশ রায়। টান টান করে দেখলেন তিনটে লাইন লেখা হয়েছে। লেখার পর লাইন তিনটে কেটে দিয়েছে সত্য। প্রথম লাইন,

'এখানকার সব পাখি বোবা হয়ে গেছে।' লাইনটা দুবার কেটে দ্বিতীয় লাইন লিখেছে, 'এখানে পাখিরা আর কথা বলে না।' এটাও দুবার কেটেছে ছোকরা। তৃতীয় লাইন, 'পাখিরা এখন মূক, পাখি নেই বলে।' এটা একবার কাটা।

চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল সতীশ রায়ের। কবিতা লিখছে নাকি ছোকরা? কী সর্বনাশ! দিনরাত ঘরে বসে কবিতা লিখছে আর কাটছে? মেজাজ টঙে উঠল তাঁর। ইচ্ছে হল ওর ঘরে গিয়ে কবিতার ভূত ভাগাতে। মতির মা তাঁর মুখ দেখে বলে উঠল, 'বড়বাবু!'

'আঃ। যাও। দূর হও এখান থেকে।' চিৎকার করতেই মতির মা অদৃশ্য হল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন সতীশ রায়। খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগে একটা বিহিত করা দরকার।

গাড়িটা অ্যাম্বাসাডার। পা ছড়িয়ে বসতে বেশ আরাম লাগে। দুপাশে বাড়িঘর, মুদির দোকান, একটা পুকুর পেরিয়ে পাঠশালার সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন ড্রাইভারকে। পাঠশালার দুটো ঘর। বাইরের সাইনবোর্ডে লেখা, 'পাঠশালা।' ভেতর থেকে পড়ুয়াদের গলা ভেসে আসছে।

গাড়ির শব্দ শুনে দ্রুত বেরিয়ে এলেন মাস্টার মশাই নিতাই দাস। হাতজোড় করে বললেন, 'আপনি এখানে কেন কষ্ট করে এলেন। আমায় ডেকে—।'

কথা শেষ করতে দিলেন না সতীশ রায়, 'পাঠশালা কেমন চলছে?'

'ভালো। এবছর যারা ক্লাস ওয়ানে ভর্তির পরীক্ষা দিয়েছিল সবাই পাশ করেছে।

'বাঃ।' মাথা নাড়লেন সতীশ রায়। 'কোন অসুবিধে?'

'বড়বাবু, অসুবিধে তো থাকবেই। কিন্তু তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়।'

'হুম্। আপনার চাকরি আর কতদিন?'

'হয়ে এল। ষাট বছরের পর তো আর চাকরি থাকে না।'

'তখন কী করবেন?'

'আমি জানি না। ভাবলেই চোখে সরষে ফুল দেখি, তাই ভাবি না।'

'আপনার জায়গায় কে পড়াবে?'

'পাঠশালা কমিটি ঠিক করবেন।'

'কেউ কি এখন সাহায্য করছে আপনাকে?'

'সাহায্য? ঠিক সাহায্য নয়। নাগেশ্বরবাবুর মেয়ে পার্বতী রোজ আসে। কী

করে পড়াতে হয় তাই শেখাচ্ছি তাকে।'

'একটু ডাকুন তো ওকে।'

নিতাই মাস্টার দরজার কাছে গিয়ে ডাকতেই পার্বতী বেরিয়ে এল। বাপের উচ্চতা পেয়েছে মেয়ে। পাঁচ ফুট। কিন্তু প্রস্থে প্রায় এক দরজার সমান। এইটুকু হেঁটে আসতেই সময় লাগল. 'জ্যেঠু!'

'কেমন পড়াচ্ছ?'

'আমার ভাল্লাগে না।'

'তাহলে আসছ কেন?'

'বাবা রাগ করে। বলে নিজের পায়ে দাঁড়া।' পার্বতী বলল, 'এই সকাল দশটা থেকে তিনটে পর্যন্ত নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোমরে ব্যথা হয়ে গেছে জ্যেঠু।'

'ভেতরে যাও।'

পার্বতী চলে গেলে সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওখানে বসার ব্যবস্থা নেই? চেয়ার টেয়ার।'

'না। শিশুরা সতরঞ্চির ওপর বসে পড়ে। আমরাও মাটিতে আসন পেতে বসে পড়াই। এতে দূরত্ব কমে যায়।'

'তাহলে পার্বতী বসে পড়ায় না কেন?'

'আজ্ঞে, ওর যা শরীর পা মুড়ে বসতে পারে না। প্রথমদিন চেষ্টা করে বসেছিল কিন্তু দুটো পা এত অবশ হয়ে গিয়েছিল যে অনেক কষ্টে ওকে তোলা হয়েছিল।' নিতাই মাস্টার বললেন।

অনেক চেষ্টায় হাসি সামলালেন সতীশ রায়। তারপর বললেন, 'একটা অ্যাপ্লিকেশন দিন। কমিটি যাতে আপনার চাকরি আরও কয়েক বছর বাড়িয়ে দেয় তার চেষ্টা করব।' সতীশ রায় গাড়িতে উঠলেন।

একটু এগিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন নিতাই মাস্টার। তাঁর চোখ উপচে জল বেরিয়ে আসছে। সহানুভূতির কথা শুনলে আজকাল শরীরটা আর বশে থাকে না।

গাড়ি চলছিল নির্জন পথ দিয়ে। হঠাৎ সাইকেলটা চোখে পড়ল। লোকটা সাইকেল রাস্তার একপাশে দাঁড় করিয়ে মাথার ওপর হাত নিয়ে যেতেই ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললেন সতীশ রায়। একেবারে লোকটার মুখোমুখি গাড়ির জানলাটা নিয়ে এল ড্রাইভার।

'নমস্কার বড়বাবু।' লোকটির নাম হরেকৃষ্ণ।

'নমস্কার। তাহলে সাইকেল পেয়ে গেছেন?' জিজ্ঞাসা করলেন সতীশ রায়।

'হ্যাঁ।' হাসি ফুটল হরেকৃষ্ণের মুখে, 'পেয়ে গেছি। আর ভয় নেই।'

'ঠিক বললেন না। ভয় আছে।'

'আছে?'

'হ্যাঁ। যদি শুনি কোনও বেকার লোক অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে চোলাই বিক্রি করছেন তাহলে আপনার ভাটিখানা ভেঙে দেওয়া হবে।'

'ছি ছি ছি! অমন কাজ করব কেন?'

'না করলেই মঙ্গল। পাবলিক কাজটা করলে পুলিশ আসবে না আপনাকে সাহায্য করতে তা যতই লাইসেন্স পান। মনে রাখবেন কথাটা।'

'নিশ্চয়ই মনে রাখব। কিন্তু বড়বাবু, একটা কথা—কে বেকার কে বেকার নয়, কার আঠারো হয়েছে কার সতেরো তা বুঝব কী করে?'

'প্রথম কাউকে চাকরি দিন যে সবাইকে চেনে। চলো।'

ড্রাইভার ইঞ্জিন চালু করল। মদ্যপান তিনি নিজেও করেন। কিন্তু কখনই শোভনসীমার বাইরে যান না। তাছাড়া নিজের বাড়ির বাইরে গিয়ে কখনই পান করেননি তিনি। ভাটিখানা যখন চালু করল হরেকৃষ্ণ তখন অনেকেই তাঁর কাছে আপত্তি জানিয়েছিল। যদিও ভাটিখানাটা বসতির বাইরে, জঙ্গলের কোল ঘেঁষে কিন্তু অভাবী মানুষগুলো সেখানে ছুটে যাবেই। যারা যাবে তারা চোলাই খেয়ে নিজেকে সামলাতে পারবে না। তার প্রতিক্রিয়া ডুডুয়ার সংসারগুলোতে পড়বেই। এদিকে নিজে যতই বিলিতি দামি জিনিস খান, সেটা তো মদই, অন্যকে নিষেধ করেন কী করে? তাহলে পান করা ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু গোরক্ষ তাঁকে যুক্তি দিল, 'একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের অধিকার আছে নিজের পছন্দমতো পানীয় খাওয়ার। সেটা খেয়ে সে যদি অন্যের অপকার না করে তাহলে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়।'

হরেকৃষ্ণর বাড়ি মেখলিগঞ্জে। বাইরের লোক। তবু তাকে ডেকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন সতীশ রায়। তখনও সে হাতে লাইসেন্স পায়নি। এদিকের গ্রামগুলোতে বাড়িতেই তৈরি চোলাই প্রকাশ্যে বিক্রি হয়। হরেকৃষ্ণ কাগজপত্র দেখিয়েছিল। সে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছে।

এই একটা বিষফোঁড়া। কিন্তু মেনে না নিয়ে কী করবেন।

পোস্ট-অফিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চিৎকার শুনতে পেয়ে গাড়ি

থামাতে বললেন। গোরক্ষ আর নাগেশ্বর ছুটতে ছুটতে আসছে। কাছে এসে নাগেশ্বর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'টাইট করে দিয়েছি।'

'কী টাইট করলে?' সতীশ রায় অবাক।

'পোস্ট-অফিসের দুই কর্মচারীকে। আপনার নাম বলতেই একেবারে কেঁচো। এখন থেকে ঠিক সময়ে পোস্ট-অফিস খুলবে, বন্ধ করবে। খুলে চরতে বেরুবে না। তবে একটু সুখের কথা, পোস্টমাস্টারও আগামী পরশু ফিরে আসছে।' নাগেশ্বর যেন বিশ্বজয় করে এসেছে এমন হাসি হাসল।

সতীশ রায় বুঝলেন। এদের ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। পোস্ট-অফিসের কর্মচারীদের ওপর নিশ্চয়ই রোলার চালিয়ে এসেছে।

'ঠিক আছে। চলি।'

'আজ্ঞে বড়বাবু, কোথায়, মানে, কোন্ দিকে যাচ্ছেন?' গোরক্ষ জিজ্ঞাসা করল।

'সদরে।'

'উঃ। কতকাল সদরে যাইনি।' নাগেশ্বর বলল।

'কোর্টের চত্বরে ভাতের হোটেলে পাবদার ঝাল যা করে না।' গোরক্ষ মাথা নাড়ল।

'দ্যাখো, আমি কাজে যাচ্ছি। তোমরা গিয়ে কী করবে?'

'কিছু না। চুপচাপ গাড়িতে বসে থাকব। দিনের বেলায় তো আপনার সঙ্গ পাই না! কথায় বলে সাধুসঙ্গে স্বর্গবাস।' বলেই দূরে দাঁড়ানো এক কিশোরকে ডেকে নাগেশ্বর বলল, 'অ্যাই রতন, আমাদের দু-জনের বাড়িতে গিয়ে খবর দিবি, আমরা বড়বাবুর সঙ্গে সদরে যাচ্ছি।'

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলতেই ওরা দরজা খুলে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল। ড্রাইভার বিরক্ত হয়ে বলল, 'সরে বসুন।'

'সরেই তো আছি বাবা। বেশি সরলে তো বাইরে বেড়িয়ে যাব।' বেশ নরম গলায় বলল গোরক্ষ।

এই দুজন দিব্যি আছে। জমিতে দুটো চাষ লোক দিয়ে করায়। তাতেই সম্বৎসরের খাওয়া পরা চলে যায়। এতেই যথেষ্ট। তবে দু-জনের দুই ছেলে কুচবিহারের বাসে কন্ডাক্টরি করে। কাঁচা পয়সা, কিছু পাঠায় তাদের বাড়িতে।

গাড়ি চলছিল ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে। শুনশান রাস্তা। দুপাশে চাষের মাঠ। সতীশ রায় ভেবে নিলেন। প্রথমে ডিসি অফিসে যেতে হবে। সেখান থেকে কো-

অপারেটিভ অফিসে। তারপর অবনীদার খোঁজ নিতে হবে।

ধূপগুড়ি পেরিয়ে গেল। সতীশ রায় দেখলেন মানিকজোড় চুপচাপ চলছে। জলঢাকা নদী আসতেই ওরা সোজা হল। নাগেশ্বর ঝুঁকে নদী দেখল, 'দ্যাখ মাছ ধরছে। কী মাছ?'

'পুঁটি?' গোরক্ষ জবাব দিল গম্ভীর মুখে।

'কী করে বোঝা গেল?'

'গিয়ে দেখলেই হয়।'

এদের কখনই মিল হয় না অথচ দুজন দুজনাকে ছেড়ে চলবে না। সতীশ রায় হাসলেন। নাগেশ্বর বলল, 'ধাবা, কষা মাংস।'

গোরক্ষ বলল, 'উহুঁ। মাটন তরকা, জবাব নেই।'

নাগেশ্বর পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখল সতীশ রায় চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। নিঃশব্দে হাত ঘুরিয়ে সে গোরক্ষকে জানিয়ে দিল, কোনও লাভ হবে না। গোরক্ষ বলল, 'তবে স্ট্যান্ডার্ড খুব পড়ে গেছে। আগেব মতো নেই।'

ডিসি অফিসের কাজ শেষ করতে দুটো বেজে গেল। গাড়ির কাছে এসে সতীশ রায় দেখলেন মানিকজোড় ধারে কাছে নেই। ড্রাইভার বলল, 'ওঁরা কোর্টের দিকে গেছেন।'

এখনও এই এলাকাকে লোকে কোর্ট বলে কারণ বহু বছর এখানেই সদরের আদালতগুলো ছিল। এখন আদালত চলে গিয়েছে নবাববাড়িতে কিন্তু নামটা জড়িয়ে আছে এলাকার সঙ্গে।

গাড়ি নিয়ে কোর্টের চত্বরে ঢুকতেই ওদের দেখতে পেলেন তিনি। একটা গাছের তলায় বেঞ্চিতে বসে আছে বিমর্ষ মুখে। গাড়ি দেখে চলে এল কাছে, 'হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। তোমরা পাবদার ঝাল খেয়েছ?'

'নাঃ। খদ্দের হয় না বলে দোকান উঠে গেছে।'

'তাহলে গাড়িতে উঠে বসো।'

সেখান থেকে কো-অপারেটিভের অফিসে। গাড়ি থেকে নামার সময় সতীশ রায় বললেন, 'গোরক্ষ, তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

'আমি?' নাগেশ্বর তাকাল।

'তুমি গাড়িতেই অপেক্ষা করো।'

অফিসে ঢোকার আগে সতীশ রায় বললেন, 'এখানে কখনও আসিনি। এরা আমাকে চেনে না। তুমি একটু পরিচয়টা দিয়ো।'

'অবশ্যই।'

অফিসে ঢুকে একজন করণিককে সতীশ রায় বললেন, 'বড়সাহেব আছেন?'

'কেন? কী দরকার। আমাকে বলুন।' লোকটি সোজা হয়ে বসল।

গোরক্ষ বলল, 'আপনাকে আমি বলতে পারি, কিন্তু উনি পারেন না।'

'কেন? উনি কে?'

'ডুডুয়া বলে একটা জায়গার নাম শুনেছেন?'

'ডুডুয়া? হ্যাঁ।'

'সেই জায়গাটা ওঁর কথায় চলে। আপনার কথায় কতজন চলে?'

লোকটা সতীশ রায়ের দিকে তাকাল। সতীশ রায় নির্বিকার।

'দাঁড়ান; দেখছি।'

দু মিনিটের মধ্যে লোকটা ফিরে এল, 'আসুন।'

পরদা ঠেলে ভেতরে ঢুকল লোকটা, পেছনে ওঁরা।

টেকো মাথার অফিসার বললেন, 'ডুডুয়ার কি যেন বলছিলে—।'

'আমার নাম সতীশ রায়। লোকে বলে ডুডুয়ার সতীশ রায়।'

'অ। বলুন, বসুন।'

'আমার ওখানে তরুণ সংঘ নামে একটা ফুটবল ক্লাব আছে। তার ছেলেরা একটা কো-অপারেটিভ খুলতে চায়। আমার উকিলবাবু যা যা করার সব করবেন। কিন্তু আমি এসেছি উদ্বোধনের দিন আপনি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত যেন থাকেন সেই অনুরোধ নিয়ে।' সতীশ রায় বেশ বিনয়ের সঙ্গে বললেন, বলে বসলেন।

'কবে উদ্বোধন?' ক্যালেন্ডার দেখলেন ভদ্রলোক।

'যেদিন আপনি কাগজপত্র দেবেন।'

'অ্যাঁ। অ্যাপ্লাই করেছেন?'

'না। কালই করব।'

'আপনি অ্যাপ্লাই না করেই উদ্বোধনের কথা ভাবছেন?'

'নাহলে তো আপনার তারিখ পাওয়া যাবে না।'

'কী মুশকিল। অ্যাপ্লাই করলেই যে অনুমতি পেয়ে যাবেন তা কী করে

ভাবছেন? আর এর জন্যে সময় লাগে!' খিঁচিয়ে উঠলেন অফিসার।

'আগে থেকে উদ্বোধনের দিন ঠিক করে নিলে সুবিধে এই যে কোন্ তারিখের মধ্যে অনুমতি দিতে হবে সেটা আপনার জানা থাকবে। তা ধরুন, সামনের মাসের পনেরো তারিখ। ডি.এম. সাহেব ওই দিনটাই ঠিক করেছেন।'

'ডি.এম.?'

'উনিই তো প্রধান অতিথি হয়ে যাবেন। সত্যি বলতে কি ওঁর সাজেস্শনেই আমরা আপনাকে বিশেষ অতিথি হিসেবে স্বাগত জানাতে এসেছি।'

'ডি.এম. আমার কথা বলেছেন?' সোজা হয়ে বসলেন অফিসার, 'তাহলে, ঠিক আছে, পনেরো তারিখ রবিবার। আপনারা বারো তারিখ অনুমতি পেয়ে যাবেন। কালই সব কাগজপত্র পাঠিয়ে দিন। আমার হাতে দিয়ে যেতে বলবেন।' অফিসার একটা কাগজে লিখলেন, 'ডুডুয়ার সতীশ রায়।'

'আপনি মাছ খান?'

'হে হে হে। বাঙালির তো ওটাই প্রিয় খাবার।'

'ডুডুয়া নদীতে দেড়কেজি রুই ঘাই মারছে। ডি.এম. সাহেব দুটো নেবেন। আপনি কটা?' সতীশ রায় উঠে দাঁড়ালেন।

'একটা। দুজন তো লোক, ডি.এম. দুটো নিলে একটার বেশি নেওয়া ভালো দেখায় না। বুঝলেন না।' অফিসার ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললেন।

※

গাড়িতে বসে সতীশ রায় বুঝলেন নাগেশ্বর নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল তোমার স্ত্রীর মঙ্গলচণ্ডীর উপোস ছিল। আজ কী?'

'আজ? তিনরকমের তরকারি আর হাঁসের ডিমের ঝোল গলা অবধি খেয়ে এখন নাক ডাকছেন।' নাগেশ্বর করুণ গলায় বলল।

'আহা! একথা আগে বলবে তো! আমি ভাবলাম আজও তাঁর উপোস।'

'হুঁঃ।' নাকে শব্দ করল নাগেশ্বর।

'আজ তোমার মেয়েকে অনেককাল বাদে দেখলাম।' সতীশ রায় বললেন, 'একটু ব্যায়াম করা দরকার ওর।'

'ব্যায়াম? কোনও লাভ হবে না বড়বাবু। হাতির পেট থেকে যে বের হয় তাকে হাজার ব্যায়াম করিয়ে কেউ হরিণ করতে পারবে না, হাতিই হবে।'

'ও।'

গোরক্ষ চুপচাপ শুনছিল, এবার জোরে শ্বাস ফেলল।

'তোমার কি হল?'

'তাঁর উপোস করার অভ্যেস নেই। ভালোই খান। সব হাড়ে ঢুকে যায়। সরু সরু হাড়। জোরে বাতাস বইলে ঘরের বাইরে বের হন না।'

'সেকি? কেন?'

'পড়ে যাবেন। ছেলের আবদার ছিল, মা তুমি সালোয়ার কামিজ পরো। শহরে বুড়িরাও পড়ছে। আমি এনে দেব। শুনে আমি বললাম, বাবা, তুমি তো চলে যাবে আর আমি সারাক্ষণ দেখব একটা হ্যাঙারে ওই সালোয়ার কামিজ ঝুলছে। সেটা কি ভালো লাগবে।' গোরক্ষ বলল।

অবনীদাকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। খবরের কাগজ পড়ছেন। দেখামাত্র বললেন, 'আরে সতীশবাবু যে! ডুডুয়া ছেড়ে আমার এখানে?'

সতীশ রায় বললেন, 'কেমন আছেন দাদা?'

'ষাট কমপ্লিট করলাম তবে এখনও টাউন ক্লাব মাঠটা চারবার দৌড়াই। যেদিন পারব না সেদিন মারা যাব।' অবনীদা হাসলেন।

'একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।' সতীশ রায় বললেন।

'আপনার মতো লোক আমাকে অনুরোধ করছেন, কী ব্যাপার?'

'ডুডুয়াতে তরুণ সংঘ নামে একটা ক্লাব করেছে ছেলেরা। ফুটবল খেলে। বানারহাট বীরপাড়াতে গিয়ে ম্যাচ খেলে। কখনও হারে কখনও জেতে। কিন্তু শেখাবার কেউ নেই। নিজেরাই যা পারে তাই খেলে। আমার ইচ্ছে আপনি যদি ওদের একটু খেলাটা শেখান।' সতীশ রায় বললেন।

'ওদের বয়স কত?'

'আঠারো থেকে চব্বিশ।'

'কোনও লাভ নেই। দড়কচা মেরে গেছে। এখন শেখালে কোনও লাভ হবে না। আমি যা বলব তা ওরা করতে পারবে না। শেখার বয়স আট থেকে চোদ্দ। দেখুন যে অক্ষর চেনে না সে বুড়ো বয়সে অক্ষর চিনতে পারে কিন্তু চিনে লেখক হতে পারে না।' অবনীদা বললেন।

কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন সতীশ রায়, 'বেশ। ওই বয়সের ছেলেরাও আছে। আপনি তাদের শেখান।'

'কিন্তু এখান থেকে রোজ ডুডুয়াতে যাব কী করে?'

'শুক্রবার যাবেন। শনি রবি থেকে সোমবার ফিরে আসবেন। অথবা

সপ্তাহে চারদিন। ওখান থেকে একটা বাস সাড়ে সাতটায় আসে।'

'কথা দিচ্ছি না। একবার ওদের দেখি—।'

'আর একটা অনুরোধ। যাতায়াতের ভাড়া বাদ দিয়ে আপনার সম্মান-দক্ষিণা কত দিতে হবে?'

হো হো করে হাসলেন অবনীদা। তারপর বললেন, 'গত পঁচিশ বছর ধরে শহরে কোচিং করছি। কত ছেলে আমার কাছে খেলা শিখে কলকাতার ফার্স্ট ডিভিসনে ফুটবল খেলছে। দুজন তো ইন্ডিয়া টিমে খেলে এসেছে। কেউ আমাকে একটা টাকা দিয়েছে না আমি কারও কাছে চাইতে পেরেছি। হ্যাঁ, আমার খেলা দেখে রায়মশাই চাকরি দিয়েছিলেন। তাতেই খুশি আমি। যাব, যাব। এই ধরুন সামনের শনিবারে। বেলা দুটোয় পৌঁছাবো।'

'না অবনীদা। পারিশ্রমিক না নিলে আপনাকে দরকার নেই।'

অবনীদা সতীশ রায়ের দিকে তাকালেন, 'আমাকে পেশাদার কোচ হতে বলছেন? তাহলে অন্য লোকের কাছে যান।'

নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এলেন সতীশ রায়। একটা মানুষ এখান থেকে অতদূরে যাবে, খাটবে কিন্তু পয়সা নেবে না, এটা ঠিক কথা নয়। যতই ফুটবল-পাগল মানুষ হন, পেশাদার না হলে দায়িত্ব বাড়ে না। তাছাড়া ওঁকে টাকা দিলে তাঁদের মনে হবে না কারও দয়ার ওপর আছেন।

গাড়িতে উঠে কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন সতীশ রায়। ড্রাইভারের পাশে বসে মানিকজোড় ঢুলছে। তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে গাড়ি ময়নাগুড়ি বাইপাসের কাছে আসতে ড্রাইভারকে থামতে বললেন তিনি।

গাড়ি থামতেই ঘুম ভাঙল ওদের। সতীশ রায় বললেন, 'এবার নামো। তুমি কষা মাংস রুটি কিংবা ভাত আর তুমি মাটন তরকা রুটি খেয়ে এসো। ওই যে তোমাদের ধাবা।'

লোক দুটো নিঃশব্দে নেমে এগিয়ে গেল ধাবার দিকে। ড্রাইভারের হাতে টাকা দিয়ে সতীশ বললেন, 'তুমি কিছু খেয়ে নাও। আর ওঁদের খাবারের দাম মিটিয়ে দিয়ো।' চোখ বন্ধ করলেন তিনি।

❋

ডুডুয়ার সতীশ রায়ের কাঠের কল কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই আওয়াজ করত। ইলেকট্রিক আসার আগে জেনারেটার মেশিন চলত। তখন নিলামে গাছ কাটার অধিকার পেয়ে কাঠের ব্যবসায়ীরা ট্রাকে চাপিয়ে বড় বড়

গাছ এনে ফেলতেন স'মিলের সামনে। যে যেমন চায় তেমন সাইজের তক্তা বানিয়ে দেওয়া হত গাছ কেটে। অনেকে আবার সেইসব গাছ সরাসরি বিক্রি করে দিতেন সতীশ রায়ের কাছে। সেগুলো সতীশ রায়ের কাছ থেকে তক্তা হিসেবে কিনে নিয়ে যেত কন্ট্রাক্টররা।

কয়েক বছর হল সরকার জঙ্গলে কাঠ কাটার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। যে গাছগুলো নষ্ট হয়ে গেছে বা ঝড়ে পড়ে গেছে অথবা সরকারি প্রয়োজনে যে গাছ কাটা দরকার সেগুলোকে নিলামে তোলা হয়। ফলে অনেক কাঠের ব্যবসায়ী হাত গুটিয়ে বসে আছেন। সতীশ রায়ের কাঠের কলে আট দশ ঘণ্টার বেশি শব্দ হয় না। তবে প্রায়ই প্রস্তাব আসে, বেআইনি ভাবে কাটা গাছকে তক্তায় রূপান্তরিত করে দিতে। তার জন্যে দ্বিগুণ টাকা দিতেও তারা রাজি। কিন্তু সতীশ রায় রাজি নন। তাঁর কড়া নির্দেশ আছে কর্মচারীদের কাছে, সরকারি কাগজ ছাড়া কেউ যেন ওই ধরনের গাছের গুঁড়ি কারখানাতে না ঢোকাতে পারে। আর এই কথাটা জেলার কর্তারা জানেন। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বা পুলিশ মাঝে মাঝে অন্য কারখানাগুলোতে হানা দিলেও সতীশ রায়ের এখানে আসেন না।

আজ সকাল থেকেই কারখানার ম্যানেজারের সঙ্গে হিসেব নিয়ে বসেছিলেন সতীশ রায়। সারা মাসের আয়-ব্যয়ের অঙ্ক কষে সতীশ রায় ম্যানেজারের দিকে তাকালেন। লোকটি সৎ। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে কাজ করছেন।

সতীশ রায় বললেন. 'গতমাসে যা রোজগার করেছেন তাতে আপনাদের মাইনে, ইলেকট্রিকের বিল মিটিয়েই শেষ হয়ে যাচ্ছে। কী করা যায়?'

ম্যানেজার বললেন, 'গত চারমাসে একই অবস্থা গিয়েছে। আরও মাস দুয়েক দেখে কারখানা বন্ধ করে দিন।'

'কারখানা বন্ধ করলে বারোটা লোক যাবে কোথায়? খাবে কী?'

'কিন্তু বড়বাবু, সরকার যদি পলিসি না বদলায় তাহলে ঘর থেকে টাকা বের করে কারখানা চালাতে হবে। সেটা অন্যায়।' ম্যানেজার বললেন।

'আপনি তো অদ্ভুত লোক। নিজের সর্বনাশ নিজেই চাইছেন!'

'কেউ কি তা চায় বড়বাবু! কিন্তু আমি তো আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না। সরকার যদি জঙ্গলে কাঠ কাটতে না দেয় তাহলে কাঠ চেরাই-এর কলগুলো বাঁচবে কী করে!' ম্যানেজার বিমর্ষমুখে বললেন।

'আচ্ছা. আরও কয়েকমাস দেখুন। সামনের মাস থেকে সত্য এসে বসবে

এখানে। কাজ না থাকলে এখানেই তার সুবিধে, কবিতা লিখতে পারবে।' উঠে দাঁড়ালেন সতীশ রায়।

ম্যানেজার বললেন, 'ঠিক বুঝলাম না।'

'আমারও একই অবস্থা।' সতীশ রায় ঘড়ি দেখলেন। বেলা হয়েছে।

ম্যানেজারবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, 'বড়বাবু, একটা কথা বলব?'

সতীশ রায় তাকালেন।

'শুনতে পাচ্ছি কিছু খাস জমি সরকার বিক্রি করবেন।'

'আমিও শুনেছি। ওগুলো উঁচু নিচু জমি। জল দাঁড়ায় না। চাষ হবে না। বিক্রি করতে চাইলে খদ্দের পাবে কোথায়?'

'আপনি যদি কিনে নেন?'

'তার চেয়ে পকেটের টাকা ডুডুয়ায় ফেলে দিতে বলুন। কম পরিশ্রম।'

'আমার কথা একটু শুনুন। যদি তিন চার একর জমি পাওয়া যায় তাহলে একটা চাষ হতে পারে। আমরা ওখানে চা-গাছ লাগাতে পারি।'

হাঁ হয়ে গেলেন সতীশ রায়, 'চা গাছ?'

'হ্যাঁ বড়বাবু। এদিকের চা বাগানগুলোতে লেবার ট্রাবল লেগেই আছে। তার ওপরে ঠিকঠাক যত্ন না নেওয়ায় চায়ের পাতার মানও কমে গেছে। আমরা যদি যত্ন করে চা গাছ তৈরি করি তাহলে দেখতে হবে না।' ম্যানেজার বলল।

'গাছ লাগালেন, পাতাও হল। তা সেগুলো থেকে চা তৈরি করতে কত টাকার কারখানা বানাতে হয় তা জানেন?' সতীশ রায় এবার বিরক্ত হলেন।

'আমরা কারখানা করব কেন? যাদের কারখানা আছে তারা আমাদের কাছ থেকে পাতা কিনবে।' ম্যানেজার বোঝাল।

'কেন কিনবে? তাদের নিজেদের বাগানেই তো পাতা হচ্ছে।'

'যে পাতা হয় তাতে তো সারাবছর মেশিন চলে না। কয়েকশ' লোকের মাইনে, সার, অন্য সব খরচ মিটিয়ে পাতার যা দাম পড়ে তার চেয়ে সস্তায় যদি আমাদের কাছ থেকে পায় তাহলে নেবে না কেন?' ম্যানেজার উৎসাহের সঙ্গে বললেন।

একটু ভাবলেন সতীশ রায়। তারপর বললেন, 'দেখি, ভেবে দেখি। চা-গাছ তো একদিনে বড় হয় না। তিনবছরে কত ইনভেস্টমেন্ট সেটাই আগে হিসেব করে দেখতে হবে। তাছাড়া এ ব্যাপারে সরকারের অনুমতি নেওয়া দরকার কিনা তাও জানতে হবে। দেখি।'

কিন্তু বাড়ির পথে আসার সময় সতীশ রায়ের মনে হল এই ম্যানেজার লোকটা কাঠচেরাই করে শেষ হয়ে যায়নি। এই যে খাস জমিতে চা-বাগান তৈরি করার কথা ভাবা, এর মধ্যেও একটা স্বপ্ন দেখার চেষ্টা আছে। যারা স্বপ্ন দেখতে চায় তারা সহজে মরে না। তাঁর সত্যচরণ কবিতা লেখে, কবিরা কি স্বপ্ন দ্যাখে না?

আজ দুপুরের খাওয়া বেশ জমিয়ে খেলেন সতীশ রায়। প্রতিটি রান্নাই সুস্বাদু। খেয়েদেয়ে ঘরে এসে পান আর সিগারেট নিয়ে ডাকলেন, 'মতির মা। কেউ ওকে ডেকে দাও।' সেদিন একটু কড়া গলায় ধমক দিয়েছিলেন, দেওয়ায় কাজ হয়েছে।

মতির মা এসে দাঁড়াল দরজায়, ঘোমটা মাথায়।

'হঠাৎ তোমার রান্নার হাত খুলে গেল কী করে? এ বাড়িতে তো অনেক বছর আছ এরকম রান্না কখনও রাঁধেনি।' সতীশ রায় বললেন, 'ভালো, বেশ ভালো।'

'আমি তো রাঁধিনি।' মতির মা নিচু গলায় বলল।

'ও। কে রেঁধেছে?'

'আপনি বলেছিলেন রান্নার জন্যে কাউকে আনতে—!'

'হ্যাঁ, এ কে?'

'গুরুচরণ হালদারের মেয়ে। বিয়ে হয়েছিল। এখন বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছে। বাপের অবস্থা খারাপ।'

কে গুরুচরণ হালদার মনে করতে পারলেন না সতীশ রায়। জিজ্ঞাসা করলেন, 'পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো?'

'ওকে ডাকব?'

'ডাকো।'

সিগারেট খাচ্ছিলেন তিনি। এসময় তাঁর চোখ স্ত্রীর ছবির দিকে যাবেই। আজও গেল। মৃত মানুষের ছবির চোখ কি মাঝে মাঝে বদলে যায়? চোখ সরাতেই শুনতে পেলেন, 'ডেকেছেন?'

মুখ ঘুরিয়ে মেয়েটিকে দেখালেন। বছর তিরিশের, বেশ লম্বা চেহারা।

'তুমি রান্না করেছ?'

'হ্যাঁ। খারাপ হয়নি তো?'

'না। কি নাম?'

'এলোকেশী।'

'তোমাদের কোন্ বাড়ি?'

'ব্লক অফিসের কোয়ার্টার। বাবা দু'বছর হল বদলি হয়ে এসেছেন।'

'তাই বলো। পুরোনো লোক হলে চিনতে পারতাম। তা তুমি এ বাড়িতে এসে রান্না করছ, তোমার বাবা আপত্তি করেননি?'

'না। বিধবা মেয়ে বাচ্চা সমেত অভাবের সংসারে এলে কোন বাবাই খুশি হয় না। এতে স্বস্তি পেয়েছে। বলেছে, কোনও কাজই ছোট না।'

'কথাটা ঠিক। মাইনে ঠিক হয়েছে?'

'কার সঙ্গে কথা বলে ঠিক হবে?'

'কেন? মতির মা কিছু বলেনি?'

'বলতে এসেছিল। আমি শুনিনি।'

'কেন?'

'মাইনে ঠিক করবে মালিক। ও কি আমার মালিক?'

থতমত খেয়ে গেলেন সতীশ রায়। তাঁর মুখের ওপর এরকম কথা আজ পর্যন্ত কোন কর্মচারী বলেনি। অবশ্য এই মেয়েটিকে ওই অর্থে কর্মচারী বলা যায় না।

সতীশ রায় বললেন, 'তুমি কত টাকা চাও?'

'আমি কিছু চাই না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে একটা কাজের মধ্যে আছি তাতেই আমার শান্তি। আপনার বিবেচনায় যা হয় দেবেন।'

'এসো।'

'যাচ্ছি। একটা কথা বলব?'

সতীশ রায় তাকালেন।

'খোকা নাকি ঝাল খেতে ভালবাসে না। কিন্তু আমার রান্না চেটেপুটে খেয়েছে। সেই থেকে মতির মায়ের মুখ গোমড়া হয়ে আছে। আমি কি খোকার জন্যে রাঁধব না?'

'মতির মা যা বলে তাই করবে।'

'আপনি মাংস খান না শুনলাম।'

'হ্যাঁ।'

'আমি একদিন রাঁধি, একটু চেখে দেখুন।'

হেসে ফেললেন সতীশ রায়, 'দেখা যাবে।'

'যাকগে। এখানে এসে শুনেছিলাম আপনি নাকি ভীষণ রাগী। কেউ মুখ তুলে আপনার সঙ্গে কথা বলে না। ভুলটা ভাঙল।' এলোকেশী চলে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন সতীশ রায়। এ মেয়ে কথা বলে না খই ফোটায়। বিধবা, এক বাচ্চার মা বলে মনেই হয় না। নাঃ। একে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। মাইনে যখন নেবে তখন কর্মচারীর মতো ওকে থাকতে হবে এই বাড়িতে।

আজ বিকেল থেকে আকাশে মেঘ। দুপুরের পরে আলিপুর দুয়ারের জেলেপাড়ায় গিয়েছিলেন সতীশ রায়। সেখান গিয়ে জেনেছেন জালে মাছ ধরতে হলে কী কী উপকরণ লাগে। জাল দুরকমের। হাত জাল আর টানা জাল। হাত জাল নদীতে ছুঁড়ে ফেলতে একটু কসরত লাগে। মাছও বেশি পাওয়া যায় না। টানাজাল ঘণ্টা তিনেক ফেললে ভালো মাছ ওঠে। তবে তার জন্য অন্তত দুটো ছোট নৌকো দরকার। দুজন খুব দক্ষ মাছ ধরিয়েকে ভাড়া করেছেন সতীশ রায়। তারা এসে ছেলেদের দুদিন ধরে মাছ ধরা শেখাবে। আসবে আগামীকাল।

বানারহাটের সঙ্গে খেলে তিন এক গোলে হেরে ছেলেগুলো মনমরা হয়ে ছিল। এই খবরে উৎসাহিত হল। ট্রেনার দুজন থাকবে ক্লাব ঘরে। তাদের খাওয়া-দাওয়া বিভিন্ন বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হবে।

আজ ঘরেই আসর বসেছিল। মেঘ আছে বলে দিনের আলো বেশ আগেই ফুরিয়েছিল। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

নাগেশ্বর বলল, 'বড়বাবু। একটা কথা বলব?'

সতীশ রায় ওদের উলটোদিকে ইজিচেয়ারে বসেছিলেন। চুরুটের ধোঁয়া ছাড়লেন, কথা বললেন না।

নাগেশ্বর বলল, 'পাঁচ বছর ধরে এক ব্র্যান্ড খাচ্ছি, অরুচি ধরেছে।'

'ওই দামের মধ্যে অন্য কি পছন্দ, কিনতে পারো।'

'দশ বিশ টাকা বেশি দিলে—।'

'অভ্যেস খারাপ কোরো না নাগেশ্বর।' সতীশ রায় বললেন।

'হক্ কথা।' গোরক্ষ বলল, 'খারাপ অভ্যেস মানেই সর্বনাশ।'

হরিপদ এল, 'ঘটকবাবু এসেছেন।'

'এই অসময়ে! সাড়ে সাতটা বাজতে না বাজতেই তো ছুটবে। ডাকো

তাকে।' সতীশ রায় বললেন। হরিপদ চলে গেল।

নাগেশ্বর বলল, 'লোকটা খুব লোভী।'

'কী করে বোঝা হল?' গোরক্ষ বলল।

'বড়বাবু মুখের ওপর নাকচ করে দিলেন তবু আশা ছাড়েনি।'

ঘটকমশাই ঘরে এলেন, 'ও, আজ আপনারা এখানেই।'

'বসে পড়।' সতীশ রায় বললেন।

ঘটকমশাই বসলেন। মানিকজোড়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

'কী মনে করে?'

'বড়বাবু, সুখবর আছে।' ঘটকমশাই মাথা নাড়লেন।

'কীরকম কী রকম?'

'মনে হচ্ছে আপনি যেরকম চেয়েছিলেন সেরকম পাত্রীর সন্ধান পেয়েছি। একেবারে একশতে একশ বলছি না, আমি তো চোখে দেখিনি।'

'কানে শুনেছ?' সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বৃত্তান্ত বল।'

'আজ একটা দরকারে মালবাজারে গিয়েছিলাম। বেলা এগারোটা নাগাদ পেট্রোলপাম্পের পাশে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় ওঁরা এলেন।' ঘটকমশাই গল্প বলছেন।

'কারা?' সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'দেখেই বুঝলাম বাইরের লোক। বাস ধরবে ফিরে যাবে বলে। কাছে এসেই তাঁরা নিবন্ধ শুরু করলেন। কথাবার্তায় বুঝলাম মেয়ে দেখতে এসেছিলেন। হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। ওঁদের দলে ঘটক ছিল। সে বেচারা খুব বকুনি খাচ্ছিল। সুযোগ বুঝে লোকটাকে একটু আলাদা ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? লোকটা বলল, 'মুখ পুড়িয়ে দিল মেয়েটা। ও মেয়ের বিয়ে হবে না।'

'কার মেয়ে?'

'মহাদেব সেনের নাতনি। আমার পার্টি না হাতছাড়া হয়ে যায়। বলেই লোকটা দলে মিলে গেল।' ঘটকমশাই থামলেন।

'আচ্ছা বেকুব তো! অন্য পার্টি যে মেয়েকে ছি ছি ছি করছে তার খবর এনেছেন এখানে? ডুডুয়া কি আবর্জনা ফেলার জায়গা?' গোরক্ষ জিজ্ঞাসা করল।

'আহা, পুরোটা শুনুন আগে।' ঘটকমশাই বললেন, 'একে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম কে মহাদেব সেন? খবর মিলল। বাজারের কাছে বড় স্টেশনারি দোকান আছে। নিকামের রাস্তায় বেশ বড় বাগানওয়ালা বাড়ি। গেলাম দোকানে। বুঝলাম খুব ভালো বিক্রি। একজন কর্মচারী তখন সবে বাড়ি থেকে দোকানে ঢুকেছে। মুখ গম্ভীর। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মহাদেববাবু কোথায়?' লোকটা বলল, 'বাড়িতে। তবে আজ যাবেন না। খুব মন খারাপ।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'পাত্রপক্ষ এসেছিল নাতনিকে দেখতে। পছন্দও করেছিল। কিন্তু নাতনি শেষে এমন একটা প্রশ্ন করল যে তারা বিগড়ে গিয়ে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে।'

'নাতনি মানে? ছেলের মেয়ে?'

'না। কোনও ছেলে নেই। একমাত্র মেয়ে বিধবা। তার মেয়ে।' হঠাৎ লোকটার খেয়াল হল, 'আপনার কি দরকার?'

'আমি একজন ঘটক। ভালো পাত্র আছে সন্ধানে।'

'অন্য জায়গায় দেখুন। এখানে লাভ হবে না।'

'কেন? দেখতে খারাপ?'

'দূর! বেশ সুন্দর দেখতে। ডানা কাটা পরী নয় কিন্তু সুন্দর। তবে মুখ খুললে চোখ কপালে উঠবে। মা-দিদারা মেরেধরেও শেখাতে পারছে না।'

'কীরকম?'

'এই তো, আজ। পাত্রপক্ষ অনেক প্রশ্ন করেছিল। সব কটার উত্তর ঠিকঠাক দিয়েছে। শেষে বলে কিনা আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি? পাত্রের বাবা বললেন, নিশ্চয়ই। বল। মেয়ে বলল, আপনার ছেলে এত ম্যাদামারা কেন? বোবা হয়ে বসে আছে।'

হো হো করে হেসে উঠলেন সতীশ রায়। হাসি থামতেই চাইছিল না তাঁর। তাঁকে হাসতে দেখে নাগেশ্বর আর গোরক্ষ হাসতে লাগল। শেষপর্যন্ত 'উরে ব্বাবা' বলে হাসি থামালেন সতীশ রায়।

ঘটকমশাই বললেন, 'মেয়ের কথা শুনে এক সেকেন্ডও দাঁড়াননি পাত্রপক্ষ। হন হন করে বেরিয়ে গেছেন বাড়ি থেকে। ওঁদেরই আমি দেখেছিলাম বাসস্ট্যান্ডে। একবার ভাবলাম সেনবাড়ি থেকে ঘুরে আসি। তারপর ঠিক করলাম আপনার মতামতটা নেওয়া দরকার। তাই চলে এলাম।'

'হরিপদ।' হাঁকলেন সতীশ রায়।

হরিপদ অবাক হয়ে হাসি শুনছিল। ছুটে এল ভেতরে।

'ঘটকবাবুকে আমার থেকে এক পাত্র দে।' সতীশ রায় দরাজ হলেন।

'আপনার থেকে?' নাগেশ্বর বিমর্ষ হল।

'আমার থেকে দিলে তোমাদের কম পড়বে না।'

'কিন্তু বড়বাবু, আমি যে পান করি না।' ঘটকমশাই কুঁকড়ে গেলেন।

'এরকম পাত্রী তোমার অভিজ্ঞতায় কটা আছে?'

'একটাও না।'

'তাহলে ব্যতিক্রমও হয়। তুমি পান করলেও তাই হবে। নাও, গ্লাস তোল। বলো, চিয়ার্স! উঃ কি শব্দ। ম্যাদামারা!'

ঘটকমশাই বাধ্য হয়ে গ্লাসে চুমুক দিলেন। দিয়ে মুখ বিকৃত করলেন।

গোরক্ষ জিজ্ঞাসা করল, 'বড়বাবু। ম্যাদামারা মানে কি?'

'খুব ভালো কথা। নইলে বড়বাবু খুশি হবেন কেন?' নাগেশ্বর বলল।

সতীশ রায় গ্লাস শেষ করলেন, 'কবে যাব?'

ঘটকমশায় বুঝতে পারলেন না, 'কোথায়?'

'তোমার সঙ্গে আমি তীর্থ করতে যাব নাকি? মালবাজারের মহাদেব সেনের নাতনিকে দেখতে কবে যাব?' সতীশ রায় আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনি-আপনি যাবেন?' ঢক্ করে অনেকটা খেয়ে ফেললেন ঘটকমশাই। 'আমার মন বলছিল, ঠিক বলছিল!'

'আরে এই মেয়েকে দেখব না তো কাকে দেখব?' সতীশ রায় বললেন, 'যে মেয়ে মুখের ওপর বলতে পারে ম্যাদামারা, সে ফালতু না।'

'ছবি এনেছেন? দেখি?' নাগেশ্বর হাত বাড়াল।'

'আমি তো সেনমশাই-এর বাড়িতে যাইনি। ছবি কি করে পাব?'

'গিয়ে যদি দেখি মেয়ে ট্যারা তাহলে?' নাগেশ্বর বলল।

'না না। কর্মচারী বলেছে সে সুন্দরী।'

গোরক্ষ বলল, 'কেউ নিজেদের জিনিস খারাপ বলে? কানা পটল বিক্রি করার সময় বলে রাজার পটল।'

'উহুঁ। যে মেয়ে ট্যারা বা অন্য কোনও খুঁত আছে সে কখনও এমন কথা পাত্রপক্ষকে বলবে না। সে চাইবে যেন তেন প্রকারে সিঁদুর পরতে! আমি হলফ করে বলতে পারি এই মেয়ে শুধু সুশ্রী নয়, সুন্দরীও। ঘটকবাবু, তুমি ওঁদের সঙ্গে

কথা বলে দিন ঠিক করো। আমি এই মেয়েকে দেখতে যাব।' সতীশ রায় ঘোষণা করলেন।

ঘটকমশাই-এর এত আনন্দ হল যে তিনি চোখ বন্ধ করে হাসতে লাগলেন।

গোরক্ষ বলল, 'আপনার শেষ বাস চলে গেল।'

'অ্যাঁ।' চমকে উঠলেন, 'কটা বাজে।'

'সাড়ে সাতটা।'

'কী হবে? কী করে ফিরব এখন?'

সতীশ রায় বললেন, 'ফিরতে হবে না। হরিপদ।'

হরিপদ এল। সতীশ রায় বললেন, 'ঘটকবাবুকে আর এক পাত্র দে। এমন সুখবর নিয়ে এসেছেন আজ, আনন্দ করা যাক।'

'কিন্তু বড়বাবু, আমার স্ত্রী!'

'ফোন আছে বাড়িতে? আশেপাশে?'

'আজ্ঞে আছে। পাশের বাড়িতেই আছে।'

'নাম্বার বলুন।'

'নাম্বার! উঃ। নাম্বার মনে পড়ছে না! গুলিয়ে যাচ্ছে।' ঘটকমশাই মাথায় হাত দিলেন।

'যাক। আপনার কোন চিন্তা নেই। এখানেই দুটি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বেন? আরে মশাই রাস্তায় তো পড়ে যাননি।'

অগত্যা দ্বিতীয় গ্লাস নিলেন ঘটকমশাই। প্রথমটি শেষ করার পর তাঁর মনে বেশ ফুর্তি এল। গোরক্ষ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনার তো অনেক অভিজ্ঞতা?'

'তা আপনাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে প্রায় চল্লিশ বছরের।'

'সবচেয়ে যেটা সেরা সেটা শোনান।' গোরক্ষ বলল।

'শুনবেন!' গ্লাসে চুমুক দিলেন ঘটক মশাই। এখন আর মুখ বিকৃত করছেন না তিনি। বললেন, 'বছর দশেক আগের কথা। ছেলের বয়স বাইশ। সদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে। বাপের বয়স ছেচল্লিশ। বিপত্নীক। ছেলের জন্যে মেয়ে দেখতে বলেছিলেন আমাকে। দেখলাম। রামসাই-এর জমিদারবাবুর মেয়ে। বছর উনিশ বয়স। রূপের দেমাক আছে। তা থাক। বাপ গেলেন পাত্রী দেখতে। পছন্দ হয়ে গেল। দেনাপাওনার কথাও চুকে গেল। কিন্তু ছেলে বসল বেঁকে। সে বিয়ে

করবে না। অনেক অনুরোধ, চোখরাঙানি বৃথা গেল। সে নাকি আরও পড়াশুনা করবে। বাপ বেশি চাপ দিতে পালিয়ে গেল কলকাতায় মাসির বাড়িতে। কর্তা ফাঁপরে পড়লেন। বিয়ের কাজ অনেক এগিয়ে গেছে। কেনাকাটাও হয়ে গেছে। আমায় বললেন, খবরটা রামসাই গিয়ে দিয়ে আসতে। কাঁপতে কাঁপতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম ম্যারাপ বাঁধা হচ্ছে। কিছু আত্মীয়স্বজন বাইরে থেকে এসে গিয়েছে। মেয়ের বাপ চুপচাপ শুনলেন। বললেন, 'কী করা যাবে। তবে বিয়ে হবে। ওই দিন ওই লগ্নেই হবে। হাতে অন্য পাত্র আছে। একটাই অনুরোধ পাত্রের বাবাকে বলবেন আমি নিমন্ত্রণ করছি, উনি যেন বিনা সংকোচে আমার মেয়ের বিয়েতে আসেন। তাহলে আমার রাগ থাকবে না।'

'বাঃ। খুব বড় মন তো।' গোরক্ষ বলল।

'কথাটা বললাম। পাত্রের বাবা বললেন, আমার কি যাওয়া ঠিক হবে! ছেলেটা মুখ পুড়িয়ে চলে গেছে, এই মুখ দেখাব?'

বললাম, 'অত করে বলেছেন, গেলে যদি খুশি হন, যাওয়াই ভালো।'

বিয়ের দিন বিকেল বিকেল পৌঁছলাম আমরা। আদর করে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন পাত্রীর বাবা। একটু গল্পগাছার পর জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত তাড়াতাড়ি পাত্র পেয়ে গেলেন, মেয়ে লগ্নভ্রষ্টা হল না। তা কোথায় থাকে পাত্র?'

পাত্রীর বাবা বললেন, 'ওই তো, আপনার পাশে বসে আছে।'

গোরক্ষ আর নাগেশ্বর একসঙ্গে বলে উঠল, 'অ্যাঁ?'

ঘটকমশাই বললেন, 'আমিও চমকে উঠেছিলাম।' কিন্তু আমাদের কথা শুনতেই চাইলেন না ভদ্রলোক। ভয় দেখালেন ওঁর কথা অমান্য করলে রামসাই থেকে ফিরে যেতে দেবেন না। ছেলের বাবা বললেন, 'দেখুন আমার বয়স ছেচল্লিশ, আপনার মেয়ের উনিশ। ডাবলের চেয়ে বেশি। ওর শ্বশুর হওয়ার কথা আমার।'

'ছিল। কিন্তু আপনার শরীর দেখে মনেই হয় না অত বয়স হয়েছে। এখনও চল্লিশ বছর দিব্যি বেঁচে থাকবেন। তখন আমার মেয়ে বুড়ি হয়ে যাবে। আপনার ছেলে যে অন্যায় করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত আপনাকেই করতে হবে। ওই বাড়ির বউ হয়ে যাবে আমার মেয়ে।'

'তার পর?' গোরক্ষ জিজ্ঞাসা করল।

'তারপর আর কি? জোরজবরদস্তি করে বিয়ে হয়ে গেল।' ঘটকমশাই বললেন।

'আমার খাওয়ার সময় হয়েছে। উঠছি।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সতীশ রায়।

নাগেশ্বর জিজ্ঞাসা করল, 'এই দশ বছরের খবর কী?'

'ছেলে প্রেম করে বিয়ে করে ব্যাঙ্গালোরে চাকরি করছে। এঁরাও খুব দুঃখে নেই। বড় মেয়েটির বয়স নয়, ছোট ছেলের বয়স সাত। কিন্তু বড়বাবু হঠাৎ উঠে গেলেন কেন? গল্পটা কি খারাপ লাগল?' ঘটকমশাই জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তর দেওয়ার আগেই হরিপদ এল, 'এবার উঠুন।'

'উঠুন? বললেই হল। ঘটকবাবু অতিথি। এখানে থাকবেন। এখনও ওঁর গ্লাস শেষ হয়নি দেখতে পাচ্ছ না।' খিঁচিয়ে উঠল নাগেশ্বর।

'উনিও উঠবেন। ওঁকে খাবার দিয়ে তবে এলোকেশী বাড়ি যাবে।' হরিপদ জানাল।

'এলোকেশী? সে আবার কোত্থেকে এল?' গোরক্ষ জিজ্ঞাসা করল।

ঘটকমশাই তাড়াতাড়ি গ্লাস শেষ করে বললেন, 'আমার শরীরটা কিরকম গুলোচ্ছে। আমি যদি না খাই?'

ঝটপট গ্লাস বোতল সরিয়ে নিয়ে ঘটকমশাইকে নিয়ে পাশের বাথরুমে গেল হরিপদ, 'নিন, গলায় আঙুল দিয়ে বেসিনে বমি করুন। অভ্যেস নেই খান কেন?'

বলামাত্র বমি বেরিয়ে এল।

সেই শব্দে নাগেশ্বর বলল, 'তাড়াতাড়ি চল। ওই শব্দ বড় ছোঁয়াচে। এখানে থাকলে আমারও হয়ে যাবে।'

মানিকজোড় দ্রুত বেরিয়ে গেলে মুখে মাথায় জল দিলেন ঘটকমশাই। হরিপদ জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগছে?'

'অনেক ভালো।'

'পাখার তলায় বসুন। বড়বাবুর খাওয়া শেষ হলেই ডাকব।' সে বেরিয়ে গেলে ঘটকমশাই নিজেকে শক্ত করতে চেষ্টা করলেন। এই বাড়িতে আজ তার প্রথম ভাত খাওয়া। বিয়েটা দিতে পারলে সেটা পাকা হয়ে যাবে। এই সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। শরীর, তুই ঠিক হ। মনে মনে বললেন ঘটকমশাই।

হরিপদ যখন ডাকতে এল তখন ঘটকমশাই পাশের তক্তাপোশে শরীর এলিয়ে দিয়েছেন। বার তিনেক ডেকেও সাড়া পাওয়া গেল না। অতিথি অভুক্ত হয়ে রাত কাটালে বড়বাবু অসন্তুষ্ট হবেন। হরিপদ ঘটকবাবুর শরীর ধরে নাড়ল।

ঘটকবাবু পাশ ফিরে শুলেন।

অগত্যা আলো নিভিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হরিপদ।

সকালেই চলে এল ওরা আলিপুরদুয়ার থেকে। লোকদুটোর হাতে দুটো পুঁটলি ছাড়া কিছু নেই। লোকদুটোর নাম যতীন আর মতিন।

সতীশ রায় হাসলেন, 'তোমরা কি দুই ভাই?'

যতীন বলল, 'না বাবু। পাশাপাশি ঘর। আমি আগে জন্মেছি, ও পরের দিন।'

মতিন বলল, 'ওর বাবা নাম রাখল যতীন, তাই শুনে আমার আব্বা মতিন রাখল।'

'তাহলে তোমাদের ধর্ম আলাদা?'

'কিন্তু কর্ম এক।' যতীন হাসল।

হরিপদকে পাঠিয়েছিলেন ছেলেদের খবর দিতে। তারা এসে গেল।

সতীশ রায় বললেন, 'এই ছেলেদের মাছধরা শেখাতে হবে তোমাদের।'

এবার মতিন বলল, 'কেন বাবু? এঁরা সব ভদ্রলোকের ছেলে, মাছ ধরবেন কেন?'

'ওরা মাছের ব্যবসা করবে। তাই নিজেরাই মাছ ধরুক, অন্যের ওপর নির্ভর করলে ব্যবসায় মায়া বসে না। এখন তোমার দরকার দুটো নৌকো আর হাতটানা জাল। মঙ্গল।' মঙ্গলের দিকে তাকালেন সতীশ রায়।

'এগুলোর ব্যবস্থা দু দিনের জন্যে করে রেখেছি বড়বাবু।' মঙ্গল বলল।

'ও। কিন্তু এগুলো কিনে নিতে হবে।'

যতীন বলল, 'চিন্তা করবেন না, আমরা অল্প দামে ব্যবস্থা করে দেব।'

'ভালো কথা। শোন, তোমরা ওদের দুপুর একটা পর্যন্ত যা শেখাবার তা শেখাবে। আজ আর কাল। একটার পরে আর নয়।'

মতিন বলল, 'আমাদের থাকার ব্যবস্থা।'

মঙ্গল বলল, 'ক্লাবঘরে থাকতে পারেন ওরা।'

'বাঃ।' সতীশ রায় বললেন, 'আমার বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে যেয়ো।'

যতীন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা সাঁতার জানেন তো?'

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যাঁ।'

সতীশ রায় বললেন, 'যাও, কাজ শুরু করে দাও। আমি কাল দুপুরে গিয়ে

দেখব তোমরা কেমন কাজ শিখলে।'

মতিন বলল, 'শেখাবার সময় যে মাছ জালে উঠবে---।'

'সেগুলোকে জলেই ছেড়ে দেবে।' সতীশ রায় গম্ভীর গলায় বললেন।

ছেলেরা ওদের নিয়ে চলে গেল ডুডুয়ার দিকে।

জলখাবার খেয়ে ছেলেকে ডেকে পাঠালেন সতীশ রায়। সত্যচরণ দরজার কাছে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। ওই ত্রিভঙ্গমুরারির ভঙ্গি দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন মনে মনে। সেটাকে চেপে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কবিতা লেখো?'

সত্যচরণ কথা বলল না। মুখ তুলল না।

'এই ডুডুয়ার কোন পাখি কথা বলে না? বোবা হয়ে আছে এমন পাখি দেখেছ তুমি?'

মাথা নেড়ে না বলল সত্যচরণ।

'তুমি কি বোবা? কথা বলতে পারো না?'

'বলি তো।' সত্যচরণ কথা বলল।

'কার সঙ্গে বল? উত্তর দাও।'

'মতির মায়ের সঙ্গে বলি। কাল থেকে এলোকেশীদির সঙ্গে বলছি।' সরল গলায় জবাব দিল সত্যচরণ।

'বাঃ! কথা বলার চমৎকার সঙ্গী। শোন, এইসব উলটোপালটা কবিতা লেখা বন্ধ কর। ওই শোন, কাক চেঁচাচ্ছে। অথচ তুমি লিখছ সব পাখি বোবা হয়ে গেছে। যে জন্যে তোমাকে ডেকেছি, এখনই ডুডুয়া নদীতে যাও।'

'ডুডুয়া নদীতে?'

'হ্যাঁ। তরুণ সঙ্ঘের ছেলেরা পেশাদার জেলের কাছে মাছ ধরা শিখছে। তুমি তো সাঁতার জানো না। জলে নামতে হবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দ্যাখো। দেখেও শেখা যায়, যেটা কবিতা লেখার চেয়ে অনেক বেশি কাজে লাগবে।'

'আপনাকে আমি বলেছিলাম—।'

'কী?'

'এই মাসটা আমাকে কিছু করতে বলবেন না।'

হাঁ হয়ে গেলেন সতীশ রায়। সামলে গিয়ে বললেন, 'ও। খুব শোকে আছ?'

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হ্যাঁ বলল সত্যচরণ।

'তুমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গাণ্ডেপিণ্ডে গিলছ না? তখন শোক হাওয়া হয়ে যাচ্ছে নাকি? এখন থেকে দিনের বেলায় তোমার খাওয়া বন্ধ। রাত্রে যত পারো খেয়ো, কিন্তু যতদিন তোমার শোকপর্ব চলবে ততদিন সূর্য-উদয় থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত না খেয়ে থাকবে। যাও।' হাত নাড়লেন সতীশ রায়। আর সেটা দেখামাত্র অদৃশ্য হয়ে গেল সত্যচরণ।

বাইরে বেরিয়ে এলেন সতীশ রায়। তাঁর স্থির ধারণা, এই ছেলেটি একটি মিচকে শয়তান। নিশ্চয়ই নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে তাঁকে ভ্যাঙাচ্ছে। অথচ মাতৃহারা হওয়ার পর ওর যাতে কোন অসুবিধে না হয় তার সব ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। মতির মা তো আছেই, দুজন মাস্টার ওকে পড়াতে আসত। ভালো ভালো জিনিস কিনে দিয়েছেন। কিন্তু ছেলের ওই এক স্বভাব, তাঁকে দেখলেই শামুক হয়ে যায়। এখন মনে হচ্ছে সেটাকেই কাজে লাগাচ্ছে।

কেউ একজন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সতীশ রায় এগিয়ে গেলেন, 'কে? কী চাই আপনার?'

লোকটি প্রৌঢ়। দেখেই বোঝা যায় দরিদ্র।

'নমস্কার। আমার নাম গুরুচরণ হালদার।' হাতজোড় করলেন ভদ্রলোক।

নামটা যেন শোনা বলে মনে হল। ঠিক ঠাওর করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন, আমি কি করতে পারি?'

'আপনি বোধহয় আমাকে চিনতে পারলেন না।'

'না।'

'আমি ব্লক অফিসে কেরানির কাজ করি।'

এবার মনে পড়ল। মতির মা এঁর কথাই বলছিল। গুরুচরণ বললেন, 'বেশি দিন আসিনি। তেমন বের হই না। আপনার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ হয়নি।'

'ও। এলোকেশী—।'

'হ্যাঁ। আমার মেয়ে। সমস্যা ওকে নিয়েই।'

'বলুন।'

'অনেক ঋণ করে বিয়ে দিয়েছিলাম। ছেলের যে ক্যানসার আছে জানতাম না। বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই বিধবা হল। তারপরে শ্বশুরবাড়িতেই ছিল। সেখানে বনিবনা না হওয়ায় চলে এসেছে আমার কাছে।'

'ও।'

'বুঝতেই পারছেন, অভাবের সংসার। ঘাড়ের ওপর একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষ এসে পড়ল। খরচ চালাতে আমি হিমসিম খাচ্ছি। তা এইসময় আপনার বাড়ির মতির মা প্রস্তাবটা দিল। মেয়ে এককথায় রাজি হয়েছে দেখে আমি খুশি হলাম। বললাম, কাজের কোন ছোটবড় নেই। সব কাজই কাজ।'

'হ্যাঁ। এটা খুবই সত্যি কথা।'

'কিন্তু আমার ওয়াইফের আপত্তি হচ্ছে।'

'কেন?' সতীশ রায় অবাক হলেন।

'এখানে সমাজ আছে। পাড়া-প্রতিবেশী আছে। দুদিন পরেই তারা কথা বলবে বলে আমার ওয়াইফের ধারণা। ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়ে রাঁধুনির কাজ করতে যাচ্ছে। সম্মান ধুলোয় লুটোবে। তাছাড়া আমার আর একটি কন্যা আছে। তার বিয়ের সময় পাত্র পাব না। এটাও আমার ওয়াইফের ধারণা। দিদি অন্যের বাড়িতে রান্না করে শুনলে পাত্রপক্ষ তাচ্ছিল্য করবে।' গুরুচরণ বললেন।

'আপনার ওয়াইফের এইসব কথাকে আপনি সমর্থন করেন?'

'আজ্ঞে করি না। কিন্তু হাজার হোক তিনি তো ওয়াইফ।'

'তাহলে তো কথাই ওঠে না। মেয়েকে আর আসতে দেবেন না।'

'সেটা তো করাই যায়। কিন্তু তাতে তো সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। এই যে ভোরে একবার আসছে, দুপুরে আবার ফিরে যায়। তারপর বিকেলে এসে মাঝরাত্রে একা ফেরে। প্রত্যেকেই তো দ্যাখে। অত রাত্রে একজন যুবতী বিধবা হেঁটে এতটা পথ যাচ্ছে, লোকে তো কুকথা বলবেই। তাই আমার ওয়াইফ বলছিলেন মানুষজনের মুখ বন্ধ করা দরকার।' গুরুচরণ খুব ভেবেচিন্তে কথাগুলো বলে ফেললেন, 'দুটো উপায় আছে।'

'কিভাবে?'

'আমার ওয়াইফ বললেন, ওকে ওর শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। সে ওই পরিবারের পুত্রবধূ। স্বামীর ভিটে আঁকড়েই তার থাকা উচিত। যত কষ্ট হোক কিন্তু সম্মান- হানি হবে না। আর এর ফলে আমার ওপর চাপ কমে যাবে।' গুরুচরণ মাথা নাড়লেন।

'দ্বিতীয়টা?'

'ও যদি যাওয়া-আসা না করে তাহলে কেউ দেখতে পাবে না। আপনার বাড়ির অন্দরমহলে থাকলে কারও পক্ষে ভাবাও সম্ভব নয় যে এখানে কি

করছে।'

'এটাও আপনার ওয়াইফের কথা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কিছু মনে করবেন না, উনি কি এলোকেশীর গর্ভধারিণী?'

'আজ্ঞে না। আমার দ্বিতীয় পক্ষ। বুঝতেই পারছেন, কি অশান্তিতে আছি।'

'অনুমান করছি। কিন্তু যার ব্যাপারে এসব ভাবছেন তার কী ইচ্ছে তা জেনেছেন?

'এলোর আবার কী ইচ্ছে হবে? আমি যা বলব তাই ও মেনে নেবে।'

'তাহলে আমি বলব ওকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দিন।'

'অ্যাঁ?'

'দেখুন, আমরা বাড়িতে মেয়েমানুষ বলতে শুধু মতির মা। আমার স্ত্রী গত হওয়ার পর অন্দরমহলের সব ব্যাপার আমি ওর ওপর ছেড়ে দিয়েছি। ও যদি চায় তাহলে এলোকেশী রাত্রে এখানে থাকতে পারে। কিন্তু তাকে থাকতে হবে বাড়ির অন্য কাজের লোক যেমন থাকে সেইরকম। আপনি মতির মায়ের সঙ্গে কথা বলুন, সে-ই তো আপনার বাড়িতে গিয়ে ওকে নিয়ে এসেছে। সে যদি না রাজি হয় তাহলে মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দিন।' কথা শেষ করতে চাইলেন সতীশ রায়।

'বেশ, আপনি যখন বলছেন তখন ওর সঙ্গে কথা বলব। ও হ্যাঁ, সে রাজি হয় তাহলে বেতন কী দেবেন?' গুরুচরণ হালদার জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনিই বলুন।'

'চব্বিশ ঘণ্টা থাকার, মাসে অন্তত দু হাজার না হলে—।'

'আপনি বরং মেয়েকে নিয়ে যান।'

'না না, আপনি কত পারবেন?'

'আপনি ডুডুয়াতে তো কিছুকাল আছেন, দুহাজার টাকার মাইনেতে কোন রাঁধুনি এখানে চাকরি করছে? শুনুন, মতির মায়ের মাইনে বেড়ে বেড়ে এখন পাঁচশো হয়েছে। তার আন্ডারে সে কাজ করবে তাকে ওর বেশি দিতে পারব না।'

সতীশ রায় ঘুরে দাঁড়াতেই গুরুচরণের গলা মিনমিনে হয়ে গেল।

'বেশ। আমার ওয়াইফ অবশ্য অসন্তুষ্ট হবেন কিন্তু মেনে নিচ্ছি। তাহলে মাসের এক তারিখে আমি এসে টাকাটা নিয়ে যাব।'

'আগে মতির মায়ের সঙ্গে কথা বলুন।' সতীশ রায় বারান্দার দিকে হাঁটতে

শুরু করলেন।

গুরুচরণ পেছন পেছন এসে বললেন, 'আজ্ঞে, একটু যদি ডেকে দেন।'

'হরিপদ। হরিপদ।' হাঁক ছাড়লেন সতীশ রায়। হরিপদকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'মতির মাকে ডেকে দে। উনি কথা বলতে চান।'

নিজের ঘরে চলে এলেন সতীশ রায়। চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালেন। মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল তাঁর। অদ্ভুত মানুষ। এখানে দু-এক বছরের জন্যে সরকারি দপ্তরে বদলি হয়ে যারা আসে তাদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের এই কারণে মিলমিশ হয় না। একই বিষয় নিয়ে এত কথা বলে না কেউ। তাছাড়া তাঁর বাড়ির একজন কর্মচারীর পারিবারিক সমস্যা নিয়ে তাঁকে কেন এত কথা শুনতে হবে।

সিগারেট যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন বাইরে চিৎকার শুরু হল। সবাইকে ছাপিয়ে গেল যার গলা সে অবশ্যই এলোকেশী। এসব কি হচ্ছে? সতীশ রায় হাঁকলেন, 'হরিপদ! ওদের এবাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঝগড়া করতে বলো।'

হরিপদর গলা শোনা গেল, সবাইকে চুপ করতে বলছে।

মতির মা এল দরজায়। ঘোমটা মাথায় দিয়ে, 'খোকার তো খেতে ভালো লেগেছে, সকালের জলখাবারও পেট ভরে খেয়েছে, কিন্তু এলোকেশীকে রাত্রে এখানে থাকতে দেওয়াটা কী ঠিক হবে?'

'আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? তুমি ঠিক করো।'

'যদিও খোকা বলছিল এতদিনে একজন দিদি পেয়েছে।'

'আঃ। খোকা খোকা করো না তো! আমিও তো রান্নার প্রশংসা করেছিলাম কিন্তু তোমার মনে পড়ল খোকার কথা। ও হ্যাঁ, খোকা জলখাবার খেয়েছে কখন? আমার ঘরে আসার আগে না পরে?' সতীশ রায় তাকালেন।

'আজ্ঞে আগে।'

'হুঁ। কি খেয়েছে জলখাবারে?'

'আজ্ঞে, লুচি, বেগুনভাজা, কুমড়োর ছক্কা আর সন্দেশ।'

'বাঃ। চমৎকার। মাতৃশোকের জন্যে কটা লুচি খেয়েছে? এক ডজন?'

'গুনলে আয়ু কমে যায় বলে গুনিনি।'

'শোন মতির মা। ও যদ্দিন বাড়ির বাইরে না যাবে তদ্দিন ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত ওকে কোনও খাবার দেবে না। কথাটা ওকেও বলেছি, তোমাকেও বললাম। আমার আদেশ অমান্য হলে সবাইকে বাড়ি থেকে দূর করে দেব।'

'খোকা তো না খেয়ে মরে যাবে।' মতির মা শিউরে উঠল।

'কোনও চান্স নেই। কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মানুষ একমাস ধরে নির্জলা উপোস করেন। সন্ধের সময় তারা উপোসভঙ্গ করেন। রাত্রে যত খুশি খাইয়ো, সে বহাল তবিয়তে থাকবে। যাও।' হাত নাড়লেন সতীশ রায়।

'আমি ভেতরে আসব বড়বাবু?' দরজায় এসে দাঁড়াল এলোকেশী। আজ তাকে বেশ ছিমছাম দেখাচ্ছে। আঁচল কোমরে জড়িয়েছে। মতির মা বেরিয়ে যাচ্ছিল, তাকে দাঁড়াতে বললেন সতীশ রায়। ঘরে ঢুকল এলোকেশী, 'আপনি আমার বাবাকে বলেছেন শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দিতে?'

'তোমার সন্দেহ হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। লোকটা মিথ্যেবাদী। অসৎ।'

'তুমি ভুলে যেয়ো না উনি তোমার বাবা।'

'না ভুলছি না। কিন্তু যে বাবা টাকার লোভে নিজের মেয়েকে একটা ক্যানসার রুগীর সঙ্গে বিয়ে দেয় তাকে সৎ বলা যায় কি?'

'উনি জানতেন না?'

'সব জানতেন, সম্বন্ধ এনেছিল আমার সৎমায়ের ভাই। বাবা পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে নিজের ঘাড় থেকে আমাকে নামিয়েছিল।'

'খুব অন্যায় করেছিল। দ্যাখো এলোকেশী, আমি যতটুকু বুঝলাম, তোমার সৎমা চাইছেন না তোমাকে ওবাড়িতে রাখতে। ওখানে থেকে লোকের সামনে দিয়ে আমার বাড়িতে রোজ কাজ করতে আসাও তাঁর অপছন্দ। এক্ষত্রে সম্মানের সঙ্গে, বাপের বাড়িতে না থেকে শ্বশুরবাড়িতে যাওয়াই ভালো। তাই নয় কি?'

'আমার সন্দেহ হচ্ছে সৎমায়ের কাছে টাকার প্রস্তাব এসেছে।' এলোকেশী বলতে বলতে এবার আঁচলে চোখ ঢাকল।

'কী রকম?'

'বিধবা হওয়ার পর আমার দেওর আমাকে জ্বালিয়ে শেষ করেছিল। এমন কি স্নান করার সময় উঁকি দিত। লজ্জায় কাউকে বলতে পারতাম না। তারপর এতে যোগ হল ভাসুর। স্বামীর চেয়ে দশ বছরের বড়। তার বউ বাপের বাড়িতে গেলেই রাত্রে কোনও না কোনও বাহানায় আমাকে তার ঘরে ডাকত। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে বলত। ওর সঙ্গে যেদিন শুতে বলল সেদিন আমি পালিয়ে এসেছিলাম বাপের বাড়ি। এসব কথা আমি মা-বাবাকে বলেছি। দেওর নিতে এসেছিল আমি যাইনি। সৎ মা বলেছিল, একটু মানিয়ে নিলে যদি সবার সুবিধে

হয় তাহলে ক্ষতি কি! কদিন আগে ভাসুর চিঠি লিখেছিল সৎমাকে। পথখরচা বাবদ কত টাকা পাঠালে তিনি মেয়েকে পাঠাতে রাজি হবেন। তার স্ত্রী বাচ্চা হতে বাপের বাড়িতে গিয়েছে, তিনমাসের জন্যে। এখন হাত পুড়িয়ে খেতে হচ্ছে। পথ-খরচার নামে টাকা নিয়ে ওরা যখন জোর করে আমাকে পাঠাবে ভাবছে তখনই মতির মা গিয়ে এই কাজটার কথা বলল। আমি এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। এরপরেও আপনি কি বলবেন শ্বশুরবাড়িতে যেতে?' এলোকেশী গড়গড় করে বলে গেল।

মতির মা চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, 'তাহলে থাকুক।'

'শোন। তোমাকে আমি পাঁচশো টাকা বেতন দেব। মতির মা, তোমার বেতন পঞ্চাশ টাকা বাড়ালাম। এলোকেশী, তোমার বাবা বলেছে প্রত্যেক মাসের এক তারিখে এসে টাকাটা নিয়ে যাবে।'

'না।' খুব জোরে উচ্চারণ করল শব্দটা এলোকেশী।

অবাক হয়ে তাকালেন সতীশ রায়। মাথা নাড়ল এলোকেশী, 'আমার রোজগারের টাকা আমি কাউকে দেব না।'

'সেটা তোমার ব্যাপার। তবে দুদিন অপেক্ষা করো। পরশু থেকে তুমি এ বাড়িতে থাকতে পারবে। আসার আগে আমাকে যা যা বললে তা বাবাকে বলে আসবে। এখন যাও তোমরা, আমি বেরুবো।' সতীশ রায় উঠে দাঁড়ালেন।

'বড়বাবু।' মতির মা ঘোমটা সামনে টানল।

'আবার কী হল?'

'আমার মাইনে বাড়াবার দরকার নেই।'

'সেকি! তুমি কি গোত্রছাড়া।

'শুধু একটা কথা।'

'আবার কী কথা?'

'খোকাকে দিনের বেলায় খেতে দিন।'

অবাক হয়ে তাকালেন সতীশ রায়। সামান্য মাইনের একটি কাজের মহিলা পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়ার প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দিচ্ছে স্নেহের কারণে। বেচারা জানে না হাতে ক্ষমতা পেলেই ওর ছায়া মাড়াবে না সত্যচরণ।

মাথা নাড়লেন সতীশ রায়, 'তাহলে তাকে বলে রাজি করাও বাইরে বের হতে। ডুডুয়ায় মাছ ধরা শিখছে ছেলেরা, সেখানে যাক। কাঠচেরাই-এর কারখানায় গিয়ে বসুক। তখন তুমি দিনরাতে যত খুশি ওকে খাওয়াও, আমার

কোন আপত্তি থাকবে না। যাও।'

গাড়ি নিয়ে এস. ডি. ও.-র অফিসে যাওয়ার আগে ডুডুয়ার দিকে যেতেই এপারে বেশ ভিড় চোখে পড়ল। গাড়ি থেকে নেমে এগোতেই সবাই উল্লসিত গলায় বলল, 'উঃ কত বড় কাতলা, দুটো রুই যা উঠেছিল না। কিন্তু বড়বাবু ওরা মাছ ধরেই আবার জলে ফেলে দিচ্ছে। এত করে বলছি তবু আমাদের দিচ্ছে না।' সবাই ঘিরে ধরল তাঁকে।

সতীশ রায় হাসলেন। তারপর ওদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন ব্যাপারটা। তাঁকে দেখে যতীন উঠে এল, 'খুব ভালো মাছ আছে বাবু।'

'ছেলেরা কেমন শিখছে?'

'কোনদিন করেনি তো। হয়ে যাবে। নাহলে তো আমরা আছি।'

'তা আছ। তবে ওদের শিখতেই হবে।'

মঙ্গল এল সাঁতার কেটে এপারে, 'এরা সবাই আমাদের পাগল করে দিচ্ছে বড়বাবু। ফুটবল খেলা দেখতে মাঠে ভিড় করে না, মাছ ধরা দেখতে এসেছে।'

'ওদের ওপর রাগ কোরো না। মাছ ধরা দেখতে সবারই ভালো লাগে।' আবার গাড়িতে উঠলেন তিনি।

এস. ডি. ও.-র অফিসে যেতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল। ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর ভালো আলাপ আছে। খাতির করে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চা খাবেন?'

'না। একটা অপ্রীতিকর কাজে এসেছি।'

'বলুন।'

'ডুডুয়ার ব্লক অফিসের একজন কেরানির নাম গুরুচরণ হালদার। চেনেন?'

'মনে করতে পারছি না। কী করেছে সে?'

'ক্যান্সার পেশেন্টের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে টাকা নিয়ে।'

'সেকি?'

'মেয়ে বিধবা হয়েছে। জোর করে শ্বশুরবাড়িতে পাঠাতে চায় টাকার লোভে। বিধবা ভ্রাতৃবধূর ওপর ভাসুর দেওরের নজর আছে। এই মেয়েটি আমার বাড়িতে রান্নার কাজে লেগেছে। দুবেলা আসা-যাওয়া করছে বলে ওর বাপ-মায়ের নাকি সম্মানহানি হচ্ছে। মেয়েটিকে আমি যদি দিন রাতের জন্যে রাখি তাহলে তারা রাজি কিন্তু মোটা মাইনে দিতে হবে। অথচ মেয়েটি চাইছে বাবার লোভের শিকার না হতে। মেয়েটির মা নেই। সৎ মা-ই বাবার পরামর্শদাতা।'

সতীশ রায় বললেন।

এস. ডি. ও. বড়বাবুকে ডাকলেন। তিনি এলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডুডুয়ার ব্লক অফিসে গুরুচরণ হালদার বলে যে লোকটি আছে তাকে চেনেন?'

'চিনি স্যার।'

'কীরকম?'

'ও আগে ছিল ফালাকাটায়। কমপ্লেন হচ্ছিল বলে ডুডুয়াতে বদলি করা হয়েছে। ব্যবহার ভালো না।' বড়বাবু বললেন।

'হুঁ। এক কাজ করুন। নাথুয়াতে লোক কম আছে। আজই অর্ডার করুন যাতে সে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নাথুয়াতে জয়েন করে। দেরি করা চলবে না।' এস. ডি.ও. সাহেব জানিয়ে দিলেন।

'আর ডুডুয়াতে কাকে পাঠাবো?'

'আমাদের অফিসে যে নতুন ছেলেটি জয়েন করেছে, বিয়ে থা করেনি, ওকে পাঠিয়ে দিন কয়েকমাসের জন্যে। তারপর দেখছি।'

বড়বাবু চলে গেলে সতীশ রায় বললেন, 'খুব ভালো কাজ করলেন।'

'এসব লোককে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত কিন্তু সে-ক্ষমতা তো আমার নেই।' এস. ডি. ও. সাহেব বললেন।

সতীশ রায় বললেন, 'সামনের মাসের পনেরো তারিখে আপনাকে একবার ডুডুয়ায় আসতেই হবে।

'কী হবে সেদিন?'

'ছেলেরো কো-অপারেটিভ করেছে। তার উদ্বোধন হবে। ডি. এম. সাহেবকে দিয়ে উদ্বোধন করাব। আপনাকে থাকতে হবে।'

'কো-অপারেটিভ? কেন?'

'ওরা স্বনির্ভর হবে। কো-অপারেটিভ করে ব্যবসা করবে।'

'কী ব্যবসা?

'মাছ ধরবে ডুডুয়া থেকে। বিক্রি করবে বিভিন্ন হাটে।'

'মাছ ধরে ব্যবসা করবে বাঙালি ছেলেরা?' অবাক হলেন এস. ডি. ও.।

'হ্যাঁ। আজ থেকে ট্রেনিং নিচ্ছে ওরা।'

'কি করেছেন মশাই? নিশ্চয়ই যাব।'

'আমি আর একবার মনে করিয়ে দেব আপনাকে।'

বেরিয়ে এলেন সতীশ রায়। ডুডুয়াতে ঢোকার সময় ড্রাইভারকে বললেন,

'একবার নদীর ধারে চলো তো।'

এখন একটা বেজে গেছে। নদীর ধারে গিয়ে দেখা গেল জনশূন্য। ছেলেরাও চলে গেছে যে যার বাড়িতে। ওদের বলেছিলেন একটা পর্যন্ত নদীতে থাকতে। কথা শুনেছে। হঠাৎ ড্রাইভার বলল, 'খোকাবাবু।'

চমকে তাকালেন সতীশ রায়। একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সত্যচরণ নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। গাড়ির শব্দ পেয়েও এদিকে তাকায়নি। মনে মনে হাসলেন তিনি। পেটের দায় বড় দায়। ড্রাইভারকে বললেন, 'বাড়ি চলো।'

ড্রাইভার কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। গাড়ি ঘোরাবার আগে সে একবার সত্যচরণের দিকে তাকাল। সেটা লক্ষ করেও কিছু বললেন না সতীশ রায়।

বাড়ির পথে দূর থেকে হরিপদকে দেখতে পেলেন। হন্তদন্ত হয়ে আসছে। ড্রাইভারকে গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন সতীশ রায়। বড়বাবুর গাড়ি দেখতে পেয়ে হরিপদ বেশ বিব্রত হয়ে কাছে এসে বলল, 'মতির মা বলল খোকাবাবুকে খুঁজে আনতে।'

'কেন?'

'কোনদিন বাড়ির বাইরে যায় না, আজ বেরিয়েছে। কিন্তু তার আর ফেরার নাম নেই। বেলা প্রায় দেড়টা হয়ে গেল, খাওয়া দাওয়া করেনি। মতির মা আমাকে এমন তাড়া দিল।'

'উঠে ড্রাইভারের পাশে বসো।' সতীশ রায় হুকুম করলেন।

হরিপদ উঠে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করলে সতীশ রায় বললেন, 'একটা দামড়া ছেলে, দিনদুপুরে বেরিয়েছে, তাকে খুঁজতে যাচ্ছ তুমি? এখানেই তো তার জন্ম। তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি!'

'আমি বলেছিলাম, কিন্তু মতির মা প্রায় কান্নাকাটি করছিল।'

'বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে। তিনকুলে কেউ নেই নইলে বাড়ি পাঠিয়ে দিতাম ওকে।' বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। সতীশ রায় গেট খুলে ভেতরে পা বাড়াতে বাড়াতে বললেন, 'মতির মাকে বলো আমার খাবার টেবিলে দিতে।'

হরিপদ মাথা নাড়ল।

খাওয়া শেষ করে আয়েসে সিগারেট খেয়ে সতীশ রায় ঘড়ি দেখলেন। দুটো বাজে। তাঁর খাওয়ার টেবিলের খানিকটা তফাতে মতির মা দাঁড়িয়ে ছিল ঘোমটা মাথায়। একটাও কথা বলেনি। এখন তাঁকে শত্রু ভাবছে মতির মা।

এলোকেশী দুবার জিজ্ঞাসা করেছে এটা ওটা লাগাবে কিনা।

বিশ্রাম নিতে সবে খাটে বসেছেন, হরিপদ এল, 'একজন দেখা করতে এসেছেন সদর থেকে। অপেক্ষা করতে বলব?'

'না। যাচ্ছি। ও হ্যাঁ, এবার যাও, শ্রীমানকে ডেকে আনো। নদীর ধারে গাছের তলায় বসে তিনি বোধহয় কবিতা ভাবছেন।' সতীশ রায় বললেন।

'খোকাবাবু তো এসে গেছে।'

'কখন?'

'আপনি যখন খাচ্ছিলেন।'

'অ। কী করছিলেন তিনি কিছু বলেছেন?'

'হুঁ। বলেছে আপনি মাছ ধরা দেখতে' বলেছিলেন, কতক্ষণ সেখানে থাকতে হবে বলেননি। এখন খেতে বসেছে।' হরিপদ বলল।

'মিচকে শয়তান।' বিড়বিড় করলেন সতীশ রায়। তারপর বাইরের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। ঘরে ঢুকে চমকে উঠলেন তিনি। 'আরে! আপনি?'

'চলে এলাম। কিন্তু এ সময়ে এসে বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটালাম বোধহয়।'

'না না। দুপুরে সাধারণত ঘুমাই না আমি।' সতীশ রায় বললেন, 'নিশ্চয়ই খাওয়া-দাওয়া হয়নি। ভাত দিতে বলি?'

'না না। আমি রোজ দশটায় দুপুরের খাবার খেয়ে নিই। কিন্তু ভাই, তাদের সঙ্গে কখন দেখা করা যাবে?'

'অবনীদা, আপনি ব্যস্ত হবেন না। একটু রোদ পড়ুক, ওরা আসবে।'

'ব্যাপারটা কী হয়েছে। তোমার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে মনে হল ছেলেগুলোকে দেখা উচিত একবার। মনে হওয়ামাত্র চলে এসেছি। বাড়িতে বলে আসিনি। সন্ধের আগেই ফিরে যেতে হবে।'

'বেশ তো, তাই যাবেন।' সতীশ রায় বললেন, 'ধরুন, আজ ওদের সঙ্গে কথা বলে, খেলা দেখে আপনার ভালো লাগল। তখন কী হবে?'

'যদি দেখি ওদের মধ্যে সম্ভাবনা আছে তাহলে নিজেকে উজাড় করে দিতে আমার একটুও আপত্তি থাকবে না। দ্যাখো ভাই, ভালো ছাত্র পাওয়া খুব ভাগ্যের ব্যাপার। বেশির ভাগই চায় ফাঁকি দিতে। এখন ফুটবল খেলা একেবারে বিজ্ঞানের পর্যায়ে চলে গেছে। দুমদাম বলে কিক মারা আর ফুটবল নয়।' অবনীদা বললেন।

'বেশ। আমার প্রস্তাবটা তাহলে গ্রহণ করেছেন?'

'কী প্রস্তাব?'

'ফুটবল খেলা যেমন বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে তেমনি কোচকেও পেশাদার হতে হবে। পেশাদার কোচ কোচিং করাচ্ছেন জানলে ছেলেরা উজ্জীবিত হবে। তাদের উৎসাহ অনেক বেড়ে যাবে।' সতীশ রায় বললেন।

'ঠিক আছে। গাড়ি ভাড়া দিয়ে দিয়ো। তাহলেই হবে।'

'আপনি সপ্তাহে দুদিন আসবেন। একটা রাত থাকবেন এখানে। আপাতত গাড়িভাড়া ছাড়া আপনাকে মাসে দু-হাজার টাকা দেব। এ ব্যাপারে আর কোনও কথা নয়। আপনার ছেলেরা ফুটবল খেলে?'

'না ভাই, ঈশ্বর সন্তান দেননি। তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপসোস নেই। শত হাজার ছেলেকে ফুটবল শেখাতে গিয়ে কাছে পেয়েছি। আমরা দুই ভাই। ছোট আসামের চা-বাগানের ম্যানেজার ছিল। পঞ্চাশ বছর বয়সেই অবসর নিয়ে বাড়িতে বসে আছে।' অবনীদা বললেন।

'কেন?'

'মালিকের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না। শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হচ্ছিল। ইচ্ছে করলে এখানকার কোনও চা-বাগানে ঢুকতে পারে কিন্তু ওর সেই ইচ্ছে আর নেই। ও কিন্তু স্কুলে পড়ার সময় ভালো ফুটবল খেলত।'

সতীশ রায় কথাটা শুনে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আপনার ভাই-এর সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই।'

'কেন?' অবনীদা হাসলেন।

'একটু আলোচনা করব।'

'বেশ। ওকে বলব এখানে আসতে।'

চা খেয়ে বেলা পৌনে চারটের সময় অবনীদাকে নিয়ে মাঠে গিয়ে দেখলেন মঙ্গলরা নেই। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে বল পেটাপেটি করছে।

দুটো ছেলেকে পাঠালেন তিনি মঙ্গলের খোঁজ নিতে। অবনীদা বললেন, 'কি হে, এদের কি বাড়ি গিয়ে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসতে হয়?'

'না না। কিছু একটা হয়েছে।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে ছেলেরা এসে গেল। তাদের দেখে চক্ষু চড়কগাছ সতীশ রায়ের। খুঁড়িয়ে হাঁটছে কেউ কেউ। কারও হাতে ফোস্কা। প্রত্যেকেই বেশ কাহিল। মঙ্গল বলল, 'প্রথম দিন তো, অভ্যেস ছিল না আর ওরা খাটিয়েছেও

খুব। কাল ঠিক হয়ে যাবে।'

'তাহলে আজ তোমরা প্র্যাকটিস করছ না?'

'না মানে, সবাই বলল আজ বিশ্রাম নেবে—।' মঙ্গল বলল।

'কী হয়েছে?' অবনীদা জিজ্ঞাসা করলেন।

ঘটনাটা কী এবং কেন অল্প কথায় বললেন সতীশ রায়। শোনামাত্র অবনীদা বললেন, 'বাঃ! চমৎকার। নিজের খাবার নিজেই জোগাড় কর। এর চেয়ে আনন্দ কিছুতেই নেই। আজ যে পরিশ্রম করেছ তা যদি রোজ করো তাহলে দেখবে শরীরের সহ্য করার ক্ষমতা বেড়ে যাবে।'

সতীশ রায় বললেন, 'ইনি অবনীদা। টাউন ক্লাবের ক্যাপ্টেন ছিলেন অনেক বছর। তারপর কোচিং করেন। আজকের আধুনিক ফুটবলের কোচিং ট্রেনিং করে এসেছেন। আমি ওঁকে অনুরোধ করেছি তোমাদের ফুটবল শেখাতে।'

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা লাইন দিয়ে প্রণাম করে গেল।

অবনীদা বললেন, 'আমি ভুল দিনে এসেছি। তোমাদের শরীরের যা অবস্থা তাতে কিছু করে দেখাতে পারবে না তোমরা। আচ্ছা, এই কুচোগুলোকে দেখা যাক।'

দুজন দুজন করে দশজনকে পরপর দাঁড় করালেন তিনি। এদের বয়স দশ কী বারো। তারপর একজন আর একজনকে পিঠে তুলে দু মিনিট দৌড়ে যেতে বললেন। আগে পরে পাঁচটা দল দু মিনিট দৌড়াতেই থামতে বলে উলটোটা করতে বললেন। অর্থাৎ যে পিঠে উঠেছিল সে এবার পিঠে তুলবে। তারা দুমিনিট দৌড়ে ফিরে আসতেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কার কার কষ্ট হল? কারও হয়নি? বাঃ। এবার পাঁচজন সামনের দিকে মুখ করে পাশাপাশি দাঁড়াও। এবার তোমরা পাঁচজন যে যার পার্টনারের একেবারে পেছনে এমনভাবে দাঁড়াও যাতে দুই ইঞ্চির বেশি ফাঁক না থাকে।' ওরা বুঝতে পারছিল না, অবনীদা নিজে প্রত্যেকের অবস্থান ঠিক করে দিলেন। বললেন, 'ধরে নাও সামনে যে আছে সে বল পায়ে নিয়ে দৌড়াচ্ছে পেছনে যে আছে সে বলটা কেড়ে নেবে। কিন্তু সেটা করার আগে দুমিনিট এমনভাবে দৌড়াবে যেন সামনের ছেলের শরীরে তোমার শরীর স্পর্শ না করে। করলেই ফাউল হয়ে যাবে।'

দুজন কোনরকমে পারল, তিনজন পারল না।

অবনীদা বললেন, 'আজ বল নিয়ে না খেলে তোমরা এইটাই প্র্যাকটিস করো। যখন ঠিকঠাক পারবে তখন বুঝব তোমাদের শরীরের ব্যালেন্স এসে

গেছে।'

মঙ্গল জিজ্ঞাসা করল, 'এটা আমরা করব?'

'না। তোমরা মাটিতে শুয়ে পড়ো সবই।'

বড় ছেলেরা শুয়ে পড়ল। অবনীদা বললেন, 'এবার উপুড় হও। হ্যাঁ। ঘাসের ওপর চিবুক রেখে গোলপোস্টের দিকে তাকাও। কেউ মুখ তুলবে না। ওপরের আকাশ দেখতে পাচ্ছ?'

সবাই বলল, 'না।'

'কী দেখছ?'

'তিনটে পোস্ট।' মঙ্গল জবাব দিল।

'না। পোস্টের মাঝখানের আয়তক্ষেত্রটাকে দ্যাখো। যখন ফুটবল খেলবে তখন শুধু ওই জায়গাটায় বল মারবে, ওপরে পাশে নয়। দেখতে দেখতে বুকের মধ্যে ছবিটাকে ঢুকিয়ে ফেলো। এবার চিৎ হয়ে শোও। মনে করো সাইকেল চালাচ্ছ। কোমরের নিচের অংশ থেকে পা পর্যন্ত সাইকেলের প্যাডেল ঘোরানোর সময় যেমন করতে হয় তেমন করো তিন মিনিট। আজ পাঁচবার করলেই হবে। আমি সামনের শনিবার দুপুরে আসব। এ কদিন তোমরা নিজেদের মতো খেলো আর আমি যা শিখিয়ে গেলাম সেটা অন্তত আধঘণ্টা প্র্যাকটিস করবে। চলুন, যাওয়া যাক।' অবনীদা বললেন।

যেতে যেতে সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বুঝলেন।'

'কিছুই না। বল পায়ে পড়লে তবে বুঝতে পারব। কিন্তু আমি ওদের শনিবার আসব বলে এলাম কেন জানেন? বললাম কারণ আজ সকালে অত পরিশ্রম করে যখন শরীরের ওই হাল করেছে তখন নিজে থেকেই আমার কাছে আজ কিছু শিখতে চাইল। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট।'

অবনীদা বাসে চেপে চলে গেলেন।

কাল রাত্রে ঘটকমশাই ফোন করেছিলেন। মালবাজারের মহাদেব সেনের বাড়িতে গিয়ে কথা বলেছেন। ওঁরা খুব খুশি। সতীশ রায়ের যদি অসুবিধে না থাকে তাহলে আগামীকালই তাঁরা মেয়ে দেখাতে রাজি আছেন। সতীশ রায় বলেছেন, 'কোনও অসুবিধে নেই। তবে তুমি দুপুরে চলে এসো এখানে।'

আজ সকালে চা খাওয়ার পর ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। হরিপদ ফিরে এসে জানাল, 'খোকা এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি।'

ঘড়ি দেখলেন সতীশ রায়। সকাল আটটা। বললেন, 'এক বালতি জল ওর গায়ে ঢেলে দাও। বিছানা ভিজুক।'

মিনিট আটেক বাদে সত্যচরণ এসে দাঁড়াল। সতীশ রায় ছেলেকে আপাদমস্তক দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেলা আটটা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছ, লজ্জা করে না তোমার?'

'রাত্রে ঘুম আসে না।' মিনমিন করে বলল সত্যচরণ।

'কেন?'

'মায়ের কথা মনে পড়ে।'

'উফ্! যাকে তুমি ভালো করে চেনোনি তার জন্যে রাত জাগছ? শোনো, আজ আমি মালবাজারে যাচ্ছি। ওখানে একটি ভালো মেয়ের সন্ধান পেয়েছি। সে যদি তোমার উপযুক্ত হয় তাকে এই বাড়ির বউ করে নিয়ে আসব।' সতীশ রায় ঘোষণা করলেন। সত্যচরণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'কথাটা কি কানে গিয়েছে?'

'এটা মায়ের মৃত্যুমাস, এখন না দেখলেই কি নয়?'

'মৃত্যুমাস শেষ হয়ে এল বলে। আচ্ছা, এর আগে অনেকবার এই মৃত্যুমাস এসেছে, কই, কখনও তোমাকে এসব বলতে তো শুনিনি।' সতীশ রায় সন্দেহের চোখে তাকালেন, 'কথাটা জানিয়ে রাখলাম। আজ মেয়েটিকে দেখতে যাব।'

'আমি—।'

'না না। তোমাকে নিয়ে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তবে হ্যাঁ, পাত্রীপক্ষ চাইতে পারেন তোমাকে দেখতে। তুমি যে বোবা কালা হাবা ল্যাংড়া নও তা ওঁরা কী করে জানবেন! সেক্ষেত্রে তাঁরা দেখতে আসবেন। তখন দয়া করে মুখ বন্ধ করে থেকো না। কাল থেকে কাঠের কারখানায় গিয়ে বসবে। পাত্র বেকার, এটা শুনলে কোনো পাত্রীপক্ষের ভালো লাগার কথা নয়। কারখানায় নিয়মিত বসলে বলতে পারব তুমি আমাকে ব্যবসায় সাহায্য করছ। যাও।'

ছেলে চলে গেলে হিসেবপত্র নিয়ে বসেছিলেন সতীশ রায়, দরজায় শব্দ হল। মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন এলোকেশী আর মতির মা দাঁড়িয়ে আছে।'

'কী চাই?' বিরক্ত হলেন তিনি।

'ভগবান আছেন বড়বাবু।' এলোকেশী বলল।

'ও। তাঁর সঙ্গে দেখা হল বুঝি? যত্ত বাজে কথা। কাজের সময় বিরক্ত না

করলেই নয়। কী বলতে এসেছ বলে ফেলো।'

'বাবার বদলির অর্ডার এসেছে গতকাল। আজকের মধ্যেই যেতে হবে।' এলোকেশীর গলায় খুশি স্পষ্ট।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। বাবা তো ভেবেই পাচ্ছে না এত তাড়াতাড়ি কী করে বদলি হতে হচ্ছে! আজ দুপুরের মধ্যে বাবাকে নাথুয়াতে যেতে হবে। বাবা গেলে মাও সঙ্গে যাবে।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক। তাহলে তুমিও তো ওদের সঙ্গে যাচ্ছ!'

'না। কিছুতেই না। মাথার ওপর ভগবান আছেন তা আপনি যতই ঠাট্টা করুন। এখানে ওরা থাকলে আমার ওপর জোর ফলাতো তাই ভগবান ওদের দূরে পাঠিয়ে দিলেন।' এলোকেশী বলল, 'আজ দুপুরে গিয়ে আমার সব জিনিসপত্র এ বাড়িতে নিয়ে আসব।'

এবার মতির মায়ের দিকে তাকালেন সতীশ রায়। 'তোমার কোনও কাজকর্ম নেই?'

'বাবু, একটা কথা বলব।'

'তোমার ছোটখোকার ব্যাপার ছাড়া যে কোন ব্যাপারে বলতে পারো।'

'আজ্ঞে ও ছাড়া আমার তো কেউ নেই।'

'কী বলতে চাও?'

'ওর তো বয়স খুব কম। একটু-আধটু কাজকর্মে সড়গড় হোক তারপর মেয়ে দেখাশোনা করলে হয় না?'

'একথা তোমাকে সে বলেছে?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'আমাকে বলেনি কেন?'

'আজ্ঞে, আপনাকে মুখের ওপর বলতে ভয় পায়।'

'ওই যে সড়গড় শব্দটা বললে না? ওটা করাবার জন্যে বাড়িতে বউমা আনছি। যাও, বিরক্ত কোরো না।'

যেতে যেতে মতির মাকে বোঝাচ্ছিল এলোকেশী, কানে এল সতীশ রায়ের, 'ছোটবাবু তো নরম মনের মানুষ তাই ভেঙে পড়েছে। বিয়ের পর ঠিক হয়ে যাবে।'

মনে মনে হাসলেন সতীশ রায়। নরম মনের মানুষ! মা চলে গেছে

পনেরো বছর আগে আর এখন ওর মন নরম হয়ে ভেঙে পড়ছে। ম্যাদামারা। এবার শব্দ করে হেসেই চেপে গেলেন। লোকে শুনলে পাগল বলে ভাববে। মেয়েটা যদি তার প্রশ্নের জবাব ঠিকঠাক দেয় তাহলে সত্যচরণকে নিয়ে কোনও চিন্তা নেই।

সকালে মাছ ধরার কোচিং দেখতে গেলেন। আজ আর গতকালের মতো ভিড় নেই। লোকে যখন জানতে পেরে গেছে চাইলেও মাছ পাওয়া যাবে না তখন আর গিয়ে লাভ কি। যতীন আর মতিন কীভাবে জাল টানতে হয় তা শেখাচ্ছিল। এইসময় গোরক্ষ আর নাগেশ্বর চলে এল।

নাগেশ্বর বলল, 'কাণ্ড দেখুন। একবার মুখ তুলে দেখাবি তো কে এসে দাঁড়িয়ে আছে পাড়ে। বাড়িতে না খাওয়া হোক, পাত্রী দেখতে যাব, হাতে পাঁচ কেজি টাটকা কাৎলা থাকলে লোকে মাথা নুয়োবে। বড়বাবু, ওদের ডেকে বলি?'

'না। আমার জন্যে নিয়ম ভাঙতে হবে না। যখন বলেছি কোচিং-এর সময় যত মাছ জালে পড়বে তাদের আবার জলে ফেলে দিতে হবে তখন নিজের জন্যে মাছ চাইব কেন?' সতীশ রায় ঘড়ি দেখলেন।

'কখন শুভযাত্রা হবে বড়বাবু?' গোরক্ষ জিজ্ঞাসা করল।

'তিনটে থেকে সাড়ে তিনটে। ঘটকবাবু বলছিল ওই সময়টা নাকি যাত্রা শুরু করার পক্ষে খুব ভালো।' সতীশ রায় নদীর ধার থেকে বাড়ির পথ ধরলেন।

'নমস্কার বড়বাবু।' স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কম্পাউন্ডারবাবু নমস্কার করলেন।

'নমস্কার। সব ঠিক আছে তো?'

'কী করে ঠিক থাকবে বলুন। জ্বর পেট খারাপ আর ব্যান্ডেজ ছাড়া কোন ওষুধ তো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই। ওষুধে জ্বর না কমলে রক্ত পরীক্ষা করাতে হয়। সেটার জন্যে সদরে যেতে বললে গালাগাল খেতে হয়। তার ওপর হয়েছে নতুন জ্বালা।' কম্পাউন্ডারবাবু মুখ ঘোরালেন।

'সেটি কী?' সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'যার পেটে ভালো করে ভাত পড়ে না সে পয়সা হাতে এলে ভাটিখানায় গিয়ে আকণ্ঠ মদ গিলছে। কাল বিকেলে ধরাধরি করে নিয়ে এল একজনকে। ডাক্তারবাবু ভাগ্যিস ছিলেন। নুনজল খাইয়ে বমি করালেন। একটু সুস্থ হলে বললেন শহরে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করাতে।' কম্পাউন্ডারবাবু বললেন।

'লোকটা যে হাতে লাইসেন্স পেয়ে গেছে। আর দোকানও করেছে গ্রামের বাইরে জঙ্গল ঘেঁষে। দেখছি, কী করা যায়।'

আরও কিছুটা এগিয়ে ঘড়ি দেখলেন তিনি। বারোটা বেজে দশ। বললেন, 'লোকটার নাম হরেকৃষ্ণ।'

'ওই ভাটিখানার মালিক তো, জানি।' নাগেশ্বর বলল।

'জানো। গিয়েছ নাকি সেখানে?'

'ছি ছি বড়বাবু। আপনার অনুমতি ছাড়া কোথাও গিয়েছি?'

'শোনো, তোমরা দুজন একবার সেখানে যাও। হরেকৃষ্ণকে আমি শর্ত দিয়েছিলাম বেকার লোক এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের মদ বিক্রি করতে পারবে না। সেটা মানছে কিনা দেখবে। বলবে তার বিক্রি করা মদ খেয়ে একজন এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে ডাক্তার বলেছে শহরে নিয়ে যেতে। এরকম যেন আর না হয়। পারবে তো তোমরা?' সতীশ রায় বললেন।

গোরক্ষ বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'তাহলে তোমরা যাও। ঠিক তিনটের সময় সেজেগুজে এসো।'

'সে আর বলতে—!' নাগেশ্বর হাসল।

আজ দুপুরের খাবার মতির মা পরিবেশন করল। জানা গেল এলোকেশী গিয়েছে বাপের বাড়ি থেকে জিনিসপত্র আনতে। কিন্তু তার চেয়ে অন্য খবর জানাতে উৎসাহ বেশি মতির মায়ের, 'ছোটখোকা আজও মাছ ধরা দেখতে গেছে।'

'কখন?'

'এই তো, আপনি বাড়ি ফিরে চানে গেলেন, তখন—।'

কথা বাড়ালেন না সতীশ রায়।

খাওয়া-দাওয়া—সিগারেট শেষ পর্ব চুকলে গুরুচরণ হালদার দেখা করতে এল, 'মেয়ে নিশ্চয়ই বলেছে আমি বদলি হয়ে গেছি।'

'হ্যাঁ। বদলির চাকরির তো এই বিপদ।'

'মাত্র দুবছর হল এসেছি, আসরফ এক জায়গায় আট দশ বছর মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে অথচ আমার ঘাড়েই কোপ পড়ল। গিয়েছিলাম বি. ডি. ও.-র অফিসে। উনি কিছুই জানেন না।' গুরুচরণ ফুঁসছিল।

'আমার কাছে কেন এসেছেন সেটা বলুন।'

'আজ্ঞে, আচমকা বদলি করল কিন্তু জিনিসপত্র নিয়ে নতুন জায়গায় যাওয়ার খরচ পরে বিল করে আদায় করতে হবে। এখন এই খরচ আমি কীভাবে

করি? যদি কিছু ধার দেন।'

'কত?'

'এই ধরুন, হাজার পাঁচেক। গাড়ি ভাড়া করে মালপত্র নিয়ে যাওয়ার খরচ তো কম নয়। নতুন জায়গায় সংসার পাততেও তো খরচ হবে।'

'কতদিনে শোধ করবেন?'

'বেশিদিন না। দশ মাসে। মাসে পাঁচশো করে।' গুরুচরণ বলল।

'কথার খেলাপ হবে না তো?'

'একদম না। কারণ প্রত্যেক মাসে এলোর মাইনে বাবদ যে টাকা আপনি আমার হাতে দিতেন সেটা দশমাস দিতে হবে না। ঘরের টাকা ঘরেই রইল। সেই সঙ্গে যে ধার নিচ্ছি তা শোধ হয়ে গেল।' গুরুচরণ হাসল।

'তাহলে তো হল না।'

'মানে?' হকচকিয়ে গেল গুরুচরণ।

'আপনার মেয়ে বলেছে যে তার রোজগার করা টাকা কাউকে দেবে না।'

'একথা হারামজাদি বলেছে?'

'গালাগাল দিয়ো না। আমি দ্বিতীয়বার বরদাস্ত করব না।'

'হায় কপাল। দুধকলা দিয়ে এ কোন্ কালসাপ পুষলাম? আমার ওয়াইফ ঠিক কথা বলে। পাঁচ হাজার টাকা পথখরচা নিয়ে ওকে জোর করে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল। আমি ভাবলাম মাসে পাঁচশো পেলে বছরে তার চেয়ে বেশি পাওয়া যাবে। যে মুরগি ডিম দেবে তাকে কেন কাটব? আপনি ওর কথা কানে তুলবেন না বাবু।' গুরুচরণ ভেঙে পড়ল।

সতীশ রায় ডাকলেন, 'হরিপদ।'

হরিপদ এল। সতীশ রায় বললেন, 'দুলালকে বল গুরুচরণবাবুর মালপত্র আজই নাথুয়াতে পৌঁছে দিতে। যা ভাড়া হবে তা যেন আমার কাছ থেকে নেয়। যান আপনি ওর সঙ্গে। এর বেশি কিছু আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।'

হরিপদ গম্ভীর গলায় বলল 'চলুন।'

ঘটকমশাই এসে গিয়েছেন ঠিক সময়ে। আজ বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে তাঁকে। খেতে বললে রাজি হলেন না। বললেন, 'গিন্নিকে বলে এসেছি যদি বাবুমশাই-এর পাত্রী পছন্দ হয় তাহলে রাত্রে ওঁর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে থেকে যাব। আজ কোন চিন্তা নেই।'

সতীশ রায় আজ একটু সাজলেন। শ্বশুর হওয়ার এই সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইলেন। ভালো পাঞ্জাবি, ধুতি, পাম্প স্যু বের করলেন। অনেককাল ব্যবহার না করা পারফিউম দুই বগলে ছড়ালেন। চুল আঁচড়ালেন পরিপাটি করে।

'বড়বাবু।' দরজায় এলোকেশী।

'কী ব্যাপার?' মুখ ফেরালেন বা সতীশ রায়।

'সম্পর্ক শেষ করে এলাম। জিনিসপত্র যা ছিল নিয়ে এসেছি।'

'ভালো।'

'আপনার কাছে টাকা চাইতে এসেছিল, দেননি তো?'

'যাও স্নান-খাওয়া করে নাও।'

'যাই। পরে তো, মানে যাওয়ার সময় বলতে পারতাম না, তাই তড়িঘড়ি বলতে এলাম।'

'পরে পারতে না কেন?'

'কনে দেখতে যাবেন। শুভ কাজ। সেইসময় বিধবার মুখ দেখতে নেই।' এলোকেশী চলে গেল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তারপর স্ত্রীর ছবির দিকে তাকালেন। স্ত্রী নেই, তিনি তো বিপত্নীক। বিধবাদের যদি অত নিয়ম মেনে চলতে হয়, তাহলে বিপত্নীকদের এত স্বাধীনতা কেন?

সাড়ে তিনটে বাজতে চলল তবু মানিকজোড়ের দেখা নেই। ঘটকমশাই অধৈর্য হচ্ছেন। পাঁজিতে বলেছে সাড়ে তিনটের আগেই বেরুতে হবে।

তিনটে আঠাশে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠলেন তাঁরা। ঘটকমশাই বসলেন ড্রাইভারের পাশে। তিনি বললেন, 'ওঁরা কেন এলেন না, সময়টা জানতেন তো? আপনাকে এত মান্যি করেন।'

'এরকম ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।' সতীশ রায় বললেন।

'ও হ্যাঁ। বানারহাট থেকে রসগোল্লা নেবেন নাকি?'

'রসগোল্লা?' অন্যমনস্ক ছিলেন সতীশ রায়।

'প্রথমবার যাচ্ছেন, খালি হাতে যাবেন?'

'ও। কিন্তু ধরো, মেয়ে দেখলাম, পছন্দ হল না, তখন ওই রসগোল্লা ওরা খুশি হয়ে খেতে পারবে? আমারও মনে হবে অনর্থক নিয়ে গেলাম।'

'তা অবশ্য।' ঘটকমশাই বললেন, 'তবে রেওয়াজ আছে বলেই—।'

'ঠিক আছে। মেয়ে পছন্দ হলে মালবাজারের মিষ্টির দোকানে অর্ডার দেব

চার রকমের মিষ্টি সেন বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে।' সতীশ রায় বললেন।

ডুডুয়া থেকে ন্যাশন্যাল হাইওয়েতে ওঠার মুখে ওদের দেখতে পেয়ে ড্রাইভার গাড়ির গতি কমিয়ে বলল, 'ওই যে ওখানে।'

'গাড়ি থামাও।' সতীশ রায় বললেন।

ড্রাইভার ওদের পাশে গাড়ি থামাতেই ওরা সামনের দরজা খুলে উঠে পড়ল। ঘটকমশাই চেঁচালেন, 'আরে কী করছেন! এতখানি সরে গেলে ড্রাইভার গাড়ি চালাবে কী করে?'

গোরক্ষ দরজা বন্ধ করে মুখ নিচু করল।

সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

দুজনে দুজনের দিকে তাকাল, জবাব দিল না।

'সেই একই পোশাকে আছ, বাড়িতে স্নান খাওয়া করে আসোনি?'

দুজনে মাথা নিচু করল। ঘটকমশাই চাপে পড়ে উসখুস করছিলেন, এবার ওদের দিকে তাকাতেই বলে উঠলেন, 'ইস। কী দুর্গন্ধ।'

সঙ্গে সঙ্গে দুজনের হাত দুই পকেটে ঢুকে গেল। রুমাল বের করে দুজনেই মুখ চাপা দিলেন।

'সেকি! তোমরা এই ভরদুপুরে মদ গিলে এসেছ?' সতীশ রায় রেগে গেলেন, 'নামো, নেমে যাও গাড়ি থেকে। তোমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমার।'

গোরক্ষ মিনমিন করল, 'দোষ আমাদের না, বিশ্বাস করুন।'

নাগেশ্বর বলল, 'আমরা ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলাম।'

গাড়ি থেমে গিয়েছিল। গোরক্ষ বলল, 'একটু শুনুন, প্লিজ। আমরা হরেকৃষ্ণের ভাটিখানায় গিয়ে কোনও বেকার বা অপ্রাপ্তবয়স্ককে দেখতে পাইনি। না পেলে ঝাড়ব কী করে ওকে। তখন নাগেশ্বর বলল, ওখানকার চোলাই খেয়ে মানুষ অসুস্থ হচ্ছে। শোনামাত্র ক্ষেপে গেল হরেকৃষ্ণ। সে চিৎকার করল, সে হয়তো অন্য দোষ করে কিন্তু কখনই ভেজাল চোলাই বিক্রি করে না। এই বদনাম সে সহ্য করতে পারবে না। আমাদের প্রমাণ দিতে হবে সে খারাপ চোলাই বিক্রি করেছে। আমি অসুস্থ লোকটার কথা বললাম। শুনে সে উড়িয়ে দিল। তিনটুকরো ইলিশ সবাই খায়। কিন্তু দু-টুকরো খেলেই কারও কারও অম্বল হয়। তাই বলে কি ইলিশটা খারাপ? সে বলল, আপনারা নিজেরা খেয়ে দেখুন, খেয়ে মন্দ বলুন। আমি মেনে নেব। এই দোকান বন্ধ করে চলে যাব।'

নাগেশ্বর বলল, 'আমি ভাবলাম দারুণ মোকা পাওয়া গেল। খেয়ে খারাপ বললে ভাটিখানা উঠে যাবে। আমি তো কখনও চোলাই খাইনি। ঠিক বুঝতে না পেরে গোরক্ষকে বললাম খেতে। ও ঠিক ধরতে পারল না ভালো না খারাপ।'

'তারপর একের পর এক গ্লাস গিলে গেছ?'

'আজ্ঞে তখন আর খেয়াল ছিল না।'

'দাম দিয়েছ?'

গোরক্ষ বলল, 'দিতে চেয়েছিলাম কিছুতেই নিতে চাইল না।'

'নিতে চাইল না বলে খুব খুশি হলে?'

'না বড়বাবু। আপনার কাছে প্রসাদ পাই তাই বলে অন্য লোক, ছিঃ।'

'কাল সকালে গিয়ে দাম মিটিয়ে আসবে। না নিলে ফেলে দেবে ওর সামনে। যাও, নামো।' সতীশ রায় বিরক্ত।

'বড়বাবু।' গোরক্ষ বলল।

'পরিবারের কাছে তো বটেই। নিজের কাছেও মুখ দেখাতে পারব না।' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল নাগেশ্বর, 'আমাদের নামাবেন না।'

'কী চাও?'

'পাত্রী দেখতে যাব।' গোরক্ষ বলল, মাথা নাড়ল নাগেশ্বর।

'চমৎকার। দু-দুটো মাতালকে সঙ্গে নিয়ে পাত্রী দেখতে যাব আমি। কী ভেবেছ তোমরা।' চিৎকার করলেন সতীশ রায়।

'বেশ। আমরা গাড়িতেই বসে থাকব, নামব না। তবু তো বলতে পারব বড়বাবুর সঙ্গে পাত্রী দেখতে গিয়েছিলাম।' গোরক্ষ বলল।

'কথাটা মনে থাকে যেন। গাড়ি চালাও।'

মিনিট তিনেকের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস ওদের ঘুম পাড়িয়ে দিল, ঘটকমশাইকে খোঁচা মারতে হচ্ছিল ওদের সরাতে।

মালবাজারে পৌঁছাতে পাঁচটা বাজতে দশ। পেট্রল পাম্পের কাছে গাড়ি থামিয়ে ওদের নামতে বললেন সতীশ রায়।

তখন চোখে ঘুম ওদের। সতীশ রায় বললেন, 'ওপাশের ওই মাঠে শুয়ে ঘুমাও। ফেরার সময় ডেকে নিয়ে যাব।'

'সারাদিন খাইনি—।' গোরক্ষ বলল।

'ওসব খাওয়ার পর শরীরে খাবার খাওয়া উচিত।' নাগেশ্বর বলল।

'এই অবেলায় ভাত খেতে হবে না। পুরি তরকারি খেয়ে এখানে এসে

দাঁড়িয়ে থেকো। ধরো।' কুড়িটা টাকার নোট নাগেশ্বরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে সতীশ রায় বললেন, 'ঘটকবাবু, কোন্ পথে যেতে হবে?'

ঘটকমশাই পথ চিনিয়ে নিয়ে এলেন।

বাগান এবং বাড়ির চেহারা দেখে সতীশ রায় অনুমান করতে পারলেন এদের অবস্থা বেশ ভালো। গাড়ির শব্দে একজন বৃদ্ধ হাতজোড় করে বেরিয়ে এলেন বারান্দা থেকে। ঘটকমশাই ফিসফিস করে বললেন, 'মহাদেব সেন।'

মহাদেব সেনের বয়স সত্তরের ওপাশে। বোঝাই যাচ্ছিল, উনি সতীশ রায়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বাগানের গেট খুলে আপ্যায়ন করলেন, 'নমস্কার। আসুন।'

গাড়ি থেকে নেমে সতীশ রায় হাত জোড় করলেন, 'বাঃ, আপনার বাড়িটি বেশ সুন্দর।'

'ওই আর কী! আসতে অসুবিধে হয়নি তো?' মহাদেব জিজ্ঞাসা করলেন।

'বিন্দুমাত্র না। ঘটকবাবু পথ চিনিয়ে আনলেন।' সতীশ রায় জবাব দিলেন।

মহাদেব সেন ঘটক মশাইয়ের দিকে তাকালেন, 'আপনি বলেছিলেন ওঁর সঙ্গে আরও দুজন আসতে পারেন—!'

সতীশ রায় বললেন, 'আমি একাই এলাম। আসলে আমার বাড়ির বউ করে যাকে নিয়ে যাব তাকে আমিই দেখতে চাই প্রথমবার।'

কথা বলতে বলতে ওঁরা বারান্দা পেরিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকলেন। মহাদেব সেন বললেন, 'বসুন।'

ওঁরা বসতেই ভেতর থেকে একটি কাজের মেয়ে ট্রে-তে জলের গ্লাস রেখে সামনে এল। ঘটকমশাই জল খেলেন, সতীশ রায় বললেন, 'না।'

মেয়েটি চলে গেলে সতীশ রায়ের দিকে তাকিয়ে মহাদেব সেন বললেন, 'অনেকটা পথ এসেছেন, একটু চা।'

'হবে। ব্যস্ত হবেন না। আমি যাকে দেখতে এসেছি সে আপনার নাতনি?'

'হ্যাঁ। আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম শিলিগুড়িতে। পাত্র ইঞ্জিনিয়ার। বিয়ের দুবছরের মাথায় মেয়ে হল। সেই মেয়ের পাঁচ বছর বয়সে দুর্ঘটনা ঘটল। সেবকের রাস্তায় জিপ দুর্ঘটনায় মারা গেল জামাই। তখন থেকে ওরা এখানে। নাতনি এখানকার স্কুলে পড়েছে। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পর ওর দিদিমা চাইছে বিয়ে দিয়ে দিতে। পড়াশুনোয় তেমন মেধাবী নয় যে কলেজে পড়ে উন্নতি করতে পারবে। বুঝতেই পারছেন ওই মেয়েই আমাদের

সদানন্দ।' মহাদেব সেন বললেন।

'কি নাম?'

'প্রতিমা।'

'বাঃ।'

'আপনার ছেলে শুনলাম আপনাকে ব্যবসায় সাহায্য করে?'

প্রশ্নটা শুনে ঘটকমশাই-এর দিকে তাকালেন সতীশ রায়। তারপর নীরবে মাথা নাড়লেন।

'ভালো। আপনার কথা আমরা মালবাজারে বসেও শুনেছি। ডুডুয়ার সতীশ রায় আমার বাড়িতে আসছেন শুনলে অনেকেই দেখতে আসতে চাইত।'

'আপনি আমাকে লজ্জায় ফেলে দিচ্ছেন। আমি সামান্য ব্যক্তি। কিছু জমিজমা আর কাঠের কারখানা ছিল, আমি আরও কিছু বাড়িয়েছি। স্ত্রী চলে গেছেন পনেরো বছর আগে। সব কিছু দেখে ছেলেকে মানুষ করা যে কী সমস্যা তা আমিই জানি। তবে হ্যাঁ, ছেলে এখনকার মতো অবাধ্য, বারমুখো নয়। আবার এত ঘরমুখী যে সেটাই সমস্যা হয়েছে। এক ছেলে, তাকে ভালভাবে সংসারী করে যেতে না পারলে—।' চুপ করলেন সতীশ রায়।

'একি! এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার কথা বলছেন কেন? আপনার বয়স আমার চেয়ে অনেক কম।' মহাদেব সেন কথাটা বলতেই ভেতরের দরজায় টোকা পড়ল। 'এক মিনিট', বলে মহাদেব সেন ভেতরের দরজার পর্দা সরিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেলেন। ঘটকমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন বুঝছেন?'

'বোঝার মত কিছু কি ঘটেছে?' চাপা গলায় বললেন সতীশ রায়।

মহাদেব সেন ফিরে এসে বললেন, 'এবার নাতনিকে এঘরে আসতে বলি?'

'অবশ্যই।' সতীশ রায় মাথা নাড়লেন।

সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে যে এঘরে ঢুকল তার পরনে দামী শাড়ি যেটা সামলাতে অনেকগুলো সেফটিপিন ব্যবহার করা হয়েছে। মুখে পাউডারের প্রলেপ, চিবুক বুকের দিকে। চুল পাতা করে বাঁধা।

মহাদেব সেন বললেন, 'ওই চেয়ারে বসো দিদি।'

'জানি।' চিবুক উঠল না, মুখ থেকে শব্দ বেরুল। বেরুতেই ভেতরের দরজায় দুবার টোকা পড়ল।

'তুমি প্রতিমা?'

মাথাটা একবার ঈষৎ ওপর-নিচ হল।

'তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ না কেন?'

ধীরে ধীরে মুখ উঠল। সতীশ রায় দেখলেন মুখটি নিখুঁত। এতটা নিখুঁত তিনি আশা করেননি। দুবার কেন দশবার দেখেও হতচ্ছাড়াটার আশ মিটবে না।

'আচ্ছা মা, তুমি কি বাড়িতে এরকম শাড়ি পরে থাকো?'

মাথা নেড়ে না বলল প্রতিমা।

'তাহলে এক কাজ কর। ভেতরে গিয়ে খুব চটপট বাড়িতে যা পর তাই পরে এসো। আর আসার আগে মুখ ধুয়ে ফেলবে, চুলও খুলে যেমন থাকো তেমন হয়ে আসবে।'

বলামাত্র তড়াক করে উঠে প্রতিমা যেভাবে ভেতরে চলে গেল তাতে ঘটকমশাই-ও হেসে ফেললেন। ভেতরে তখন শাসানি চলছে আর প্রতিমা চাপা গলায় বলছে, 'আমি কী করব!'

সতীশ রায় মহাদেব সেনকে বললেন, 'আমি ওকে ওর মতো দেখতে চাই, এই কথাটা যদি ভেতরে বলে দেন—।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' মহাদেব সেন বললেন, 'সাধারণত যারা দেখতে আসেন তাঁরা সাজাগোজা অবস্থাতেই দেখতে চান।'

কাজের মেয়েটি চা নিয়ে এল। ঘটকমশাই হাত বাড়ালেন কিন্তু সতীশ রায় নিলেন না। যতটা সময় লাগতে পারে বলে সতীশ রায় ভেবেছিলেন তার অনেক আগেই প্রতিমা ফিরে এল। তার দিকে তাকিয়ে সতীশ রায় বলে উঠলেন, 'বাঃ। এই তো। এখন তোমাকে অনেক সহজ লাগছে।'

আটপৌরে শাড়ি, মুখে রঙ নেই, চুল হাত খোঁপায় আটকানো, প্রতিমা বাইরের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপল।

'আচ্ছা, তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমি কে?'

মাথা নাড়ল প্রতিমা।

'কে বল তো?'

তাকাল প্রতিমা, 'ডুডুয়ার সতীশ রায়।'

শব্দ করে হাসলেন সতীশ রায়। তারপর বললেন, 'আমার ছেলের নাম সত্যচরণ রায়। তোমার যেমন বাবা নেই, ওরও তেমন মা নেই। তবে ওর একটা অভ্যেস আছে। বেশির ভাগ সময় ঘরে বসে লেখালেখি করে।'

'কী লেখে?'

'কী জানি! আমাকে দেখায় না।' চুপ করে প্রতিমাকে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর রুমাল বের করে মুখ মুছলেন।

'আমি কি হাঁটব?' প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল।

'অ্যাঁ? শুধু শুধু হাঁটবে কেন?' সতীশ রায় বুঝতে পারলেন না।

'যারা দেখতে আসে তারা তো হাঁটতে বলে। একজন আবার ভেজা পায়ে হাঁটতে বলেছিল। মেঝেতে পায়ের ছাপ পরীক্ষা করেছিল।' প্রতিমা বলল।

'কেন?'

'ওমা, আপনি এসব জানেন না?' প্রতিমা প্রশ্ন করা মাত্রই ভেতরের দরজায় শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ নামাল সে, 'না। আমি কিছু বলব না।'

'তোমাকে হাঁটতে হবে না, খোঁপা খুলে দেখাতে হবে না কত চুল!'

'তাহলে সেলাই আনব?'

'এনে কী করবে? আমাদের বাড়ির সেলাই দর্জি করে।'

'ও।'

'আমি কি রাঁধতে পারি—।'

'সেটা জেনেও কোনও উপকারে আসবে না। কারণ রান্না করে মতির মা আর এলোকেশী। তোমাকে তারা রান্নাঘরে ঢুকতেই দেবে না।'

'তাহলে এখন কি আমাকে গান গাইতে হবে?'

'গান—!' সতীশ রায় তাকালেন।

'আমি গান গাইলে সবাই চুপ করতে বলে।'

'তাহলে গাইতে হবে না।' সতীশ রায় বললেন, 'আমি তোমাকে মাত্র একটি প্রশ্ন করব। বুঝতে পারছ?'

'না। মাত্র একটা প্রশ্ন? এর আগেরবার যারা এসেছিল তারা চৌদ্দটা প্রশ্ন করেছিল। আপনি মাত্র একটা করবেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোনও অথবা দেবেন না?'

'না।'

প্রতিমা অসহায় চোখে মহাদেব সেনের দিকে তাকাল। মহাদেব সেন বললেন, 'প্রশ্নটা শোন, উত্তর জানা থাকলে জবাব দিবি।'

'আর না জানা থাকলে ফেল করব!' বলে সতীশ রায়ের দিকে তাকাল প্রতিমা, 'জানেন, গতবার প্রশ্ন করেছিল, অসুরকে মেরে দুর্গাঠাকুর কি দশ হাত

নিয়ে কৈলাসে ফিরে গিয়েছিল না আট হাত খুলে ফেলেছিল?'

'সর্বনাশ, এর উত্তর তো আমারও জানা নেই। কি ঘটকবাবু, তুমি জানো?'

ঘটকমশাই মাথা নেড়ে না বললেন।

সতীশ রায় বললেন, 'তারপর?'

'আমি বললাম, সিংহ তো দুর্গার সঙ্গে কৈলাসে যেতে পারে না। ও হিমালয়ের জঙ্গলে থাকে। দুর্গা নেমে এসে ওর পিঠে ওঠেন প্রত্যেক বছর, তার আটটা হাত দুর্গা সিংহের কাছে জমা রেখে যান। সিংহ পাহারা দেয়।' প্রতিমা হাসল।

সতীশ রায় বললেন, 'চমৎকার, চমৎকার উত্তর।'

'ঠিক আছে। আপনি প্রশ্ন করুন।'

'আমার একটাই প্রশ্ন। তোমাকে ওই প্রশ্নের পাঁচটা উত্তর দিতে হবে। যেমন, যদি জিজ্ঞাসা করি তোমার জানা পাঁচটা ফলের নাম বলো। তুমি কী বলবে?'

'আম, লিচু, আপেল, ন্যাসপাতি, কাঁঠাল।' উত্তর দিল প্রতিমা।

'গুড। আমার প্রশ্নটারও পাঁচটা উত্তর চাই। তুমি এতদিন ধরে যত গালাগাল শুনেছ তার সেরা পাঁচটা আমাকে বলো।'

'গালাগাল?' চোখ গোল হয়ে গেল প্রতিমার। মহাদেব সেন উঠে বাইরের বারান্দায় চলে গেলেন। ভেতরের দরজায় শব্দ হলো না।

'হ্যাঁ। তুমি কি গালাগাল জানো না?'

'হুঁ।'

'পাঁচটা বেস্ট গালাগাল বলো।'

'অসভ্য।' নিচু গলায় বলল প্রতিমা।

'এ তো তোমরা সাত আট বছরেই বলতে। সবার সামনে বলতে। তবু এটাকে এক বলে ধরলাম।'

'বদমাশ?' গলা একটু উঠল।

'হ্যাঁ। দুই। তবে খুব নিরীহ গালাগাল।'

'মুখপোড়া?' গলা আরও উঠল।

'তিন। চলবে।'

'মাকাল?' এবার গলা ছাড়ল।

'বাঃ। এবার পাঁচ নম্বর। এটাই আসল। যেগুলো বলেছ তাদের থেকে কড়া

একটা কিছু বল।' সতীশ রায় উত্তেজিত।

প্রতিমা ভাবছিল কিন্তু কোনও শব্দ খুঁজে পাচ্ছিল না। তার মুখে অনেক অভিব্যক্তি কিন্তু কোনও শব্দ নেই।

সেটা লক্ষ্য করে সতীশ রায় বললেন, 'আমি তোমাকে সাহায্য করছি। কিন্তু যেহেতু তুমি বললে না তাই এটা পাঁচ নম্বর হবে না।' বলে একটু থেমে হেসে বললেন, 'ম্যাদামারা।'

'হ্যাঁ।' চোখ বড় করল প্রতিমা।

'আগের বার যারা দেখতে এসেছিলেন তাঁদের ছেলের সম্পর্কে তুমি একথা বলেছিলে, ঘটকবাবুর মুখে শুনেছি।'

'হ্যাঁ। কিরকম কেঁচোর মত বসেছিল।'

'অতএব পাঁচ নম্বরটা—।' সতীশ রায় বললেন।

'মনে আসছে না।'

'এক মিনিট সময় দিচ্ছি।'

চোখ বন্ধ করে বসে থাকল প্রতিমা। পঞ্চাশ সেকেন্ড যখন পার হয়েছে তখন চেঁচিয়ে উঠল, 'পাঁচ নম্বর হল, ঢ্যামনা।'

সতীশ রায় প্রাণখুলে হেসে উঠলেন, 'পারবে, মা তুমিই পারবে। ঘটকবাবু, ডাকুন ওর দাদুকে।'

ডাকতে হল না। তার আগেই মহাদেব সেন ঘরে ফিরে এলেন। সতীশ রায় এগিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিতে চাইলে তিনি চমকে সরে গেলেন, 'একি করছেন আপনি? ছি ছি। আপনার মতন মানুষ আমাকে—।'

'আপনি বয়সে বড়। সম্পর্কে আমার বেয়াই-এর বাবা। আমার পিতৃসমই।'

'বেয়াই?'

'আপনার ছেলে থাকলে তাঁকে ওই সম্বোধনই তো করতাম।' সতীশ রায় বললেন, 'আপনার নাতনিকে আমি পুত্রবধূ হিসেবে দেখতে চাই।'

'এ তো খুব আনন্দের কথা—।'

'প্রথমে এক কাপ চা খাব।' সতীশ রায় বললেন।

প্রতিমা দৌড়ে গেল ভেতরে।

ঘটকমশাই বললেন, 'এবার বলুন, আপনি যেমনটি চেয়েছিলেন তেমনটি পেয়েছেন তো?'

'একশতে একশ। কী বলে তোমাকে ধন্যবাদ দেব আমি জানি না।'

হাসলেন সতীশ রায়।

মুখোমুখি বসে মহাদেব সেন ইতস্তত করেও শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু মনে করবেন না, এর আগে যারা মেয়ে দেখতে এসেছে তাঁদের মতো কোনও প্রশ্ন করলেন না কেন? মানে, যাকে বলে যাচাই করে নেওয়া!'

'অর্থ হয় না। ওর মাথার চুল গোড়ালি ছুঁয়েছে কি কোমর পর্যন্ত নেমেছে তা জেনে আমার সংসারের কী লাভ হবে? ও তো স্কুলে পড়াতে যাচ্ছে না যে সাধারণ জ্ঞান কেমন সেইসব প্রশ্ন করে জানব মেধা কী রকম? একটা সুস্থ মেয়ে যার মানসিক বিকার নেই, দেখলে মন্দ লাগে না, ব্যবহার ভালো, এই তো যথেষ্ট। আজকাল বাড়িতে রাঁধুনি থাকায় রান্না কীরকম জানে এই প্রশ্নের দরকার পড়ে না। প্রয়োজন হলে বিয়ের পর রান্না শিখে নেবে।' সতীশ রায় বললেন।

'কিন্তু।'

'বলুন।'

'আপনি ওর কাছে গালাগালি শুনতে চাইলেন কেন?'

'ওটা আমার গোপন ব্যাপার।'

'কিন্তু গতবার ওর একটা কথা শুনেই পাত্রপক্ষ রেগেমেগে চলে যায়।'

'ভাগ্যিস গিয়েছিল নইলে আমি সুযোগ পেতাম না।'

'আমি কিন্তু এরকম কখনও শুনিনি। মেয়ে দেখতে এসে কেউ কি কখনও জানতে চেয়েছে পাত্রী কীরকম গালাগাল জানে? আচ্ছা, যদি ও না জানত?'

'তাহলে বলতাম না চা খাব।'

'তার মানে আপনার সংসারে যে পুত্রবধূ যাবে তার গালাগাল জানা জরুরি।'

'বলেছি তো ওটা আমার গোপন ব্যাপার।'

প্রতিমা এল ট্রেতে মিষ্টি আর চা নিয়ে। সঙ্গে যিনি এলেন তাঁকে দেখে বোঝা যায় উনি মহাদেববাবুর স্ত্রী।

মাথা নাড়লেন সতীশ রায়, 'না মা মিষ্টি নয়, আমি চা খাব।'

'এখানকার মিষ্টি খুব ভালো।' প্রৌঢ়া বললেন।

মহাদেব সেন বললেন, 'আমার স্ত্রী।'

'ওহো! নমস্কার। হ্যাঁ, আজ নয়, মিষ্টি খাব বিয়ের দিনে। ঘটকবাবু, তুমি আমার প্লেট সাবাড় করে দাও।'

'অসম্ভব, একসঙ্গে খেতে পারব না।'

'তাহলে পরে খাবেন। প্যাক করে দেব।' প্রৌঢ়া বললেন।

সতীশ রায় হাসলেন, 'তুমি দেখছি পুজোরি বামুন হয়ে গেলে।' চায়ের কাপপ্লেট তুলে নিলেন তিনি।

প্রৌঢ়া বললেন, 'আমার নাতনিকে পছন্দ হয়েছে শুনে মন ভরে গেল। আপনার বাড়িতে ও গেলে কোনও দুশ্চিন্তা থাকবে না।'

চায়ে চুমুক দিয়ে সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করে বুঝলেন?'

'আপনার কথাবার্তা শুনে।'

'কিন্তু ওকে অনেক দায়িত্ব নিতে হবে। আমার স্ত্রী গত হয়েছেন পনেরো বছর আগে। অন্দরমহল কাজের মেয়েদের হাতে। ওর মাথার ওপর শাশুড়ি বা ননদ থাকছে না। ও হ্যাঁ, আমি তো মেয়ে দেখলাম, ভালো লাগল। কিন্তু আপনারা কবে আসছেন ডুডুয়াতে?'

প্রতিমা বলে উঠল, 'দিদা মাকে নিয়ে ডুডুয়াতে গিয়েছিল।'

'তাই নাকি?' প্রৌঢ়ার দিকে তাকালেন সতীশ রায়।

'অনেক বছর আগে।' প্রৌঢ়া বললেন।

মহাদেব সেন বললেন, 'তিরিশ বছর তো বটেই। আমার মামাতো ভাই এখানেই মানুষ হয়েছিল। সে চাকরি পায় পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে। প্রথমেই পোস্টমাস্টার হয়ে ডুডুয়াতে পোস্টিং পায়। তার আবদারে উনি মেয়েকে নিয়ে দিন দশেক সেখানে থেকে সংসার গুছিয়ে আসেন। এখন সেই ছেলে প্রমোশন পেয়ে পেয়ে অনেক বড় পোস্টে চলে গেছে।'

'তিরিশ বছর আগে? কি নাম ওঁর?'

'শিবশংকর রায়।'

মাথা নাড়লেন সতীশ রায়, 'খুব ঝাপসা মনে পড়ছে। বেশিদিন থাকেননি ডুডুয়াতে। আপনারা মাত্র দশদিন ছিলেন?'

'হ্যাঁ। তখন ওখানে খুব অসুবিধে হত। এখন শুনেছি শহরে যা পাওয়া যায় তা ওখানেও পাওয়া যাচ্ছে।' প্রৌঢ়া বললেন।

'দিদা, ওই ঘটনাটা বলো।' প্রতিমা প্রৌঢ়াকে ইশারা করল।

'কী ঘটনা?' সতীশ রায় তাকালেন।

'ও কিছু না।' প্রৌঢ়া মাথা নাড়লেন।

'মা তো খুব সুন্দরী ছিল তাই ওই দশদিন বাড়িতেই বসে থাকত দিদা মাকে নিয়ে। রাস্তায় বেরুলেই লোকে নাকি হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। একটা

সম্বন্ধও নাকি এসেছিল।' প্রতিমা জানিয়ে দিল।

'তাহলে আপনারা কবে যাচ্ছেন?'

'আপনি বলছেন যখন তখন নিশ্চয়ই যাব। ঘটকমশাই-এর মুখে যা শুনেছি তাতে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি। আপনাকে জানিয়ে দেব।'

'তাহলে উঠি। হ্যাঁ, তোমাকে ভালো লাগল, একেবারে খালি হাতে এসে ফিরে যাই কী করে!' পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা গয়নার বাক্স বের করে সেটা খুললেন সতীশ রায়। তারপর একটা একভরি চেন তুলে বললেন, 'এটি আমার মায়ের ছিল। মা আমার স্ত্রীকে দিয়েছিলেন। তিনি নেই, তাঁর হয়ে আমি তোমাকে দিলাম। এটিকে কখনও হারিয়ো না।' বাক্সে চেন রেখে এগিয়ে ধরলেন সতীশ রায়।

প্রৌঢ়া বললেন, 'একি করছেন? এমন মূল্যবান জিনিস ওকে এখনই দিচ্ছেন কেন? বিয়ের পর দিলে ভালো হত।'

'কেন? আমার মন ওকে স্বীকার করে নিয়েছে সেটাই তো শেষ কথা। বিয়ে তো সমাজের স্বীকৃতির জন্যে। ওকে পরিয়ে দিন।'

প্রৌঢ়া সোনার চেন পরিয়ে দিতেই প্রতিমা সতীশ রায়কে প্রণাম করল। তারপর দাদু দিদাকে প্রণাম সেরে ঘটকমশাই-এর দিকে এগোলে তিনি না না বলে সরে গেলেন।

সতীশ রায় বললেন, 'বিয়ের দিন আপনার সুবিধে মতো ঠিক করুন। যখন ছেলেকে দেখতে যাবেন তখন জানিয়ে দেবেন।'

দরজার কাছে গিয়ে মহাদেব সেন বললেন, 'দাবিদাওয়ার ব্যাপারটা।'

'মিটে গেছে। যা চেয়েছিলাম তা পেয়ে গেছি। আচ্ছা নমস্কার। চল হে ঘটকবাবু। অনেকটা পথ যেতে হবে।' সতীশ রায় গাড়ির দিকে এগোলেন।

পেছনে সতীশ রায় সামনে ড্রাইভারের পাশে ঘটকমশাই। গাড়ি ছাড়ার আগে সেই কাজের মেয়েটি দৌড়ে এসে একটা বড় বাক্স ঘটকবাবুর হাতে তুলে দিল। ঘটকবাবু লজ্জা লজ্জা মুখে সেটি ড্যাশবোর্ডের ওপর রেখে দিলেন।

গাড়ি চলতে শুরু করলে ঘটকমশাই বললেন, 'আপনি চমকে দিয়েছেন বড়বাবু।'

'কীরকম?'

'খালি হাতে না গিয়ে মিষ্টি নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলাম। আপনি যে পকেটে সোনার গয়না নিয়ে যাচ্ছেন তা ভাবতেই পারিনি।' ঘটকমশাই বললেন,

'তখন বলেছিলেন পছন্দ হলে এখানকার দোকানে অর্ডার দিয়ে চাররকমের মিষ্টি ওবাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন। ভাল মিষ্টির দোকানে—।'

'না। আর দরকার নেই।'

'ও। আমার কথাটা মনে রাখবেন বড়বাবু।'

'কী কথাটা?'

'এই যে, আপনার মনের মতো পাত্রী জোগাড় করে দিলাম।'

'ও! নিশ্চয়ই।'

পেট্রল পাম্পের মোড়ে ওরা দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে আর একজন লোক। তফাতে ছোটখাটো ভিড়। গাড়ি থামতেই ভিড়টা বলে উঠল, 'সত্যি বলেছে, এসেছে, এসেছে।'

সতীশ রায় গাড়িতে বসেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?'

তৃতীয় লোকটি বলল, 'পঞ্চাশ টাকার খাবার খেয়েছে এরা। কুড়িটা টাকা দিয়ে বলেছে অপেক্ষা করতে, লোক এলে তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে শোধ করবে। আপনি কি সেই লোক?'

তিরিশ টাকা পকেট থেকে বের করে লোকটির হাতে দিতেই মানিকজোড় দৌড়ে সামনের আসনে উঠে বসল। গোরক্ষ বলল, 'আজকাল মানুষ অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।'

নাগেশ্বর বলল, 'ঠিক হল না, বিশ্বাস করতে কেউ শেখেইনি।'

ঘটকমশাই বললেন, 'বড়বাবু আপনাদের কুড়িটাকার পুরি তরকারি খেতে বলেছিলেন, পঞ্চাশ খেতে গেলেন কেন যখন পকেটে টাকা নেই?'

'ওই তো দোষ। হিসেব করে খেতে পারি না। বড়বাবু এটা জানেন।' নাগেশ্বর বলল।

গাড়ি চলছিল। গোরক্ষ বলল, 'আমার ডানচোখ নাচছে। তার মানে শুভ খবর। বড়বাবু, পাত্রী পছন্দ হয়েছে?'

'হুঁ।' সতীশ রায় বললেন চোখ বন্ধ করে।

গোরক্ষ চেঁচাল, 'দারুণ খবর!'

'দারুণ!' চেঁচাল নাগেশ্বর।

'আঃ! সরে বসুন।' চেঁচালেন ঘটকমশাই।

নাগেশ্বর জিজ্ঞাসা করল, 'দেখলেন?'

'কী?' চোখ খুললেন সতীশ রায়।

'ওই যে, যেটা চেয়েছিলেন—।' নাগেশ্বর বলল, 'নষ্টামির—।'

'ঝোঁক।' গোরক্ষ জুড়ে দিল।

ঘটকমশাই বললেন, 'বড়বাবুর মনের মতো হয়েছে।'

'বাঃ। কী আনন্দ। এটা কী?' ড্যাশবোর্ডের ওপর রাখা প্যাকেটের ওপর নজর পড়তেই সেটা তুলে নিয়ে খুলে ফেলল নাগেশ্বর। ঘটকমশাই বাধা দেওয়ার সুযোগ পেলেন না। নাগেশ্বর বলল, 'গোরক্ষ! ভগবান আছেন। পঞ্চাশ টাকা খাওয়া হয়ে গিয়েছে, সন্দেশ খেতে পারিনি। ভগবান সন্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছেন। নাও, শুরু করো।'

ঘটকমশাই আজ রাত্রে ফিরে যাবেন না। সতীশ রায় পাত্রী পছন্দ করলে আজকের রাতটা এখানেই আনন্দ করে যাবেন। একথা আগেই ঠিক ছিল। হরিপদ তাঁকে যে ঘরে থাকতে দিয়েছিল সেই ঘরে হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মানিকজোড় গিয়েছে যে যার বাড়িতে। বলে গেছে, এই যাব আর এই আসব। ঘটক মশাই আজ একটা কথাও বলতে পারেননি। তাঁর চোখের সামনে অন্তত কুড়িখানা বড় বড় মিষ্টি ওরা পেটের ভেতর ফেলে দিল? ভেবেছিলেন, গিন্নির জন্যে নিয়ে যাবেন মিষ্টির প্যাকেটটা কিন্তু ওই হাঘরেদের জন্যে হল না।

ঘরের দরজায় একজন এসে দাঁড়াল। পুরোপুরি সামনে নয়, দরজার পাল্লার আড়ালে শরীর রেখে এলোকেশী জিজ্ঞাসা করল, 'চা এনে দেব?'

'চা?' মাথা নাড়লেন ঘটকমশাই। 'না। সন্ধে পেরিয়ে গেছে, থাক। বরং পাখাটা কমিয়ে দিলে ভালো হয়।'

অতএব এলোকেশী ঘরে ঢুকে পাখার রেগুলেটার ঘোরাল। ঘুরিয়ে চলে গেল। তাকে দেখলেন ঘটকমশাই। এরকম সুন্দর স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল শ্যামা রমণী যে সতীশ রায়ের বাড়িতে আছে তা তাঁর জানা ছিল না। সতীশ রায় বিপত্নীক। এই রমণী কি এবাড়ির কাজের লোক? বিশ্বাস হয় না। দিনহাটার হরিশ মণ্ডল চল্লিশ বছর বয়সে বিপত্নীক হওয়ার পর এই বয়সের পাত্রী খুঁজছে। বলেছে, বিধবা হলে ভালো হয়।

এই সময় হরিপদ ঢুকল, 'বড়বাবু ডাকছেন।'

'ওহো!' উঠে দাঁড়ালেন ঘটকমশাই।

'আচ্ছা ঘটকমশাই, বাড়ির সবাই জানতে চাইছে পাত্রী যখন পছন্দ হয়েছে তখন তাকে দেখতে নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী?' হরিপদ জিজ্ঞাসা করল।

'অবশ্যই।'

মতির মা জানতে চাইছিল, 'স্বভাব খুব নরম তো?'

'মিত্রর রক্ষক শত্রুর যম।' ও হ্যাঁ, একটি মহিলা চা খাব কিনা জানতে এই ঘরে এসেছিল, বড়বাবুর আত্মীয় কেউ?'

'না না। ও হল এলোকেশী। ওর বাবা ব্লক অফিসে কাজ করত। খুব ভালো রান্না করে। বিধবা বলে বাড়িতে বোঝা হয়ে ছিল। মতির মা বড়বাবুকে বলে এ-বাড়িতে চাকরি দিয়েছে। এর আগে কখনও এমন কাজ করেনি, ভদ্রলোকের মেয়ে।'

ওরা এসে গিয়েছিল। গ্লাসে পানীয় ঢালা হয়েছে। সঙ্গে কাজু এবং চিনে বাদাম। নাগেশ্বর জিজ্ঞাসা করল, 'আজ এমন আনন্দের দিন, এদিনেও দুরকম বোতল টেবিলে থাকা কি ঠিক হবে বড়বাবু?'

'তাহলে তোমাদেরটা টেবিল থেকে নামিয়ে রাখ। হাঁটু সব সময় শরীরের নিচের দিকেই থাকে, ও-দুটোকে তো কাঁধে তুললে এক পা-ও হাঁটা যাবে না।' সতীশ রায় বললেন, 'ঘটকবাবু কোথায়? ঘুমাচ্ছে নাকি?'

ঘটকমশাই ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে সতীশ রায় বললেন, 'এসো হে, খাও, যত পারো। কিন্তু দেখো, বমি না হয়।'

ঘটকমশাই লজ্জা পেলেন, 'নো না। ওদিন প্রথমবার ছিল তো—। তবে গলার স্বর জড়িয়ে গেলে খাওয়া বন্ধ করে দেব।'

গোরক্ষ বলল, 'তাহলে শুরু হোক। চীয়ার্স।'

সবাই চীয়ার্স বললে গোরক্ষ জিজ্ঞাসা করল, 'একটা কথা জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। আপনি ঘটকবাবুকে বলেছিলেন এমন মেয়ে চাই যার মধ্যে একটু নষ্টামির ঝোঁক আছে। ছেলের জন্যে এই প্রথমবার মেয়ে দেখতে গেলেন। গিয়েই পছন্দ করলেন। তার মানে ওর মধ্যে নষ্টামির ঝোঁক দেখেছেন আপনি। সেটা কী?'

সতীশ রায় মাথা নাড়লেন, 'এসব তোমাদের না জানলেও চলবে। শুধু জেনে রেখো এ-মেয়ে সাধারণ নয়। সাদাসাপটা ভালো মেয়ে যারা তারা সেবা করতে পারে, স্নেহ ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতে পারে কিন্তু যাকে দিচ্ছে সে যদি নিতে না জানে তাহলে বেনো বনে মুক্তো ছড়ানো ছাড়া কিছু হবে না। বুনো ওলের জন্যে কী দরকার?'

নাগেশ্বর বলল, 'বাঘা তেঁতুল।'

'হ্যাঁ। এ বাড়িতে যে বউ হয়ে আসবে সে যদি লবঙ্গ-লতিকা কিংবা সাতচড়ে রা না কাড়া মেয়ে হয় তাহলে আমি চোখ বোজার পর এই ঘরে শেয়াল ডাকবে। তাই চেয়েছিলাম নষ্ট নয় কিন্তু সেদিকে একটু ঝোঁক আছে এমন মেয়েকে ঘরে আনব। ঘটকবাবুর দৌলতে আজ পেয়েও গেলাম।' সতীশ রায় বললেন।

'কিন্তু কীভাবে পেলেন? কী করে যাচাই করলেন?' নাগেশ্বর অস্থির।

'অ্যাই! চুপ করো। বড়বাবু সেটা জানাবেন না বলেছেন শুনিসনি?' গোরক্ষ চাপা গলায় ধমক দিল।

হরিপদ এল, 'বড়বাবু।'

তাকালেন সতীশ রায়। হরিপদ বলল, 'মাছের বড়া ভাজা হচ্ছে, এনে দেব?'

'মাছের বড়া? বাঃ।' সতীশ রায় বললেন, 'মুখ বদলানো যাক। মতির মা তাহলে নতুন নতুন রান্না শিখছে। আনো।'

'আজ্ঞে মতির মা নয়, এলোকেশী।' চলে গেল হরিপদ।

সঙ্গে সঙ্গে নাগেশ্বর বলে ফেলল, 'এই নামটা আগেও একদিন শুনেছিলাম।-বড়বাবু, এলোকেশী কে?'

'একজন বিধবা। শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারিতা, আবার বাবা মা এখন মনে করে গলগ্রহ। রাঁধে ভালো বলে মতির মা কাজে নিয়েছে। সন্তানও নেই।'

গোরক্ষ জিজ্ঞাসা করল, 'বয়স কেমন?'

'আমি জানতে চাইনি।' সতীশ রায় বিরক্ত হলেন।

'আমি দেখেছি একটু আগে। সাতাশ-আঠাশ হবে। বড়বাবু, একটা কথা বলছিলাম। যদি অনুমতি দেন।'

'আজ তুমি যা খুশি বলতে পারো।'

'দিনহাটায় আমার এক মক্কেল আছে। নাম হরিশ মণ্ডল। জমিজমা দু-দুটো মুদির দোকান, অবস্থা খুব ভালো। স্ত্রী গত হয়েছেন কয়েক বছর। বয়স চল্লিশ পার হলেও স্বাস্থ্য ভালো। বিয়ের ইচ্ছে হয়েছে আবার। শর্ত এক, পাত্রীকে বিধবা এবং নিঃসন্তান হতে হবে। এলোকেশীকে যেটুকু দেখলাম মণ্ডল মশাই—।'

ঘটকমশাইকে কথা থামিয়ে দিলেন সতীশ রায়, 'তুমি কি এরপর হরিপদ অথবা মতির মায়ের বিয়ের সম্বন্ধ করবে? এলোকেশী বিয়ে করবে কি করবে না

সেটা ঠিক করবে সে আর তার বাবা। আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

গোরক্ষ বলল, 'হক কথা। আপনি মশাই যেখানে ঢোকেন সেখানেই পাত্রপাত্রী খোঁজেন নাকি? ভয়ঙ্কর লোক।'

এইসময় তিনটি প্লেটে মাছের বড়া নিয়ে এল হরিপদ আলাদা করে। এক একটি প্লেটে দুটো করে।

সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটা প্লেট কম কেন?'

হরিপদ মুখ নিচু করল। বিরক্ত সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল?'

'কথাটা এলোকেশীর কানে যাওয়ায় সে খুব রেগে গেছে।' হরিপদ বলল।

'কোন্ কথাটা?'

'আজ্ঞে, ঘটকমশাই কোন্ দোজবরের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে চাইছেন—।'

'সে তো নিশ্চয়ই রান্নাঘরে বসে ভাজাভাজি করছে। শুনতে পেল কী করে?'

'আজ্ঞে, মতির মা দরজার কাছে এসেছিল। শুনে সে গিয়ে বলেছে।'

হো হো করে হাসতে লাগলেন সতীশ রায়। তারপর বললেন, 'ঘটকবাবু, এবাড়িতে একজন শত্রু তৈরি করলে হে। তুমি চিনেবাদাম খাও।'

'অন্যায় হয়ে গেছে। আর ওকথা বলব না।'

মানিকজোড় মাছের বড়ার খুব প্রশংসা করতে লাগল। সতীশ রায়েরও বেশ ভালো লাগল। হরিপদ চলে গিয়েছিল ঘর থেকে, এবার ফিরে এল চতুর্থ প্লেটটি নিয়ে। তাতে সদ্য-ভাজা দুটো বড়া আছে। ঘটকমশাইকে বলল সে, 'নিন। আপনি আর বলবেন না শুনে পাঠিয়ে দিল।'

হাসিমুখে হাত বাড়ালেন ঘটকমশাই।

বড়া খেতে খেতে নাগেশ্বর জিজ্ঞাসা করল, 'বড়বাবু, ম্যাদামারা কথাটার মানে এখনও বললেন না—।'

'তাই নাকি। আমাকে বলতে হবে না। তোমরা স্বচক্ষে দেখে নাও। হরিপদ, তোমাদের ছোটবাবুকে এঘরে আসতে বলো।' হুকুম করলেন সতীশ রায়।

হরিপদ মাথা নাড়ল, 'ছোটবাবু বাড়িতে নেই।'

'অ্যাঁ! এতরাত্রে সে বাড়িতে নেই। দিনের বেলায় যাকে বাইরে পাঠানো যায় না সে এসময় কোথায় গেল? যাও, খুঁজে বের করো তাকে?'

হরিপদ চলে যেতেই দরজায় শব্দ হল। সতীশ রায় 'কে' জিজ্ঞাসা করতে আড়ালে থাকা মতির মায়ের গলা পাওয়া গেল, 'খোকাবাবুকে কিছু বলবেন না

বড়বাবু।'

'উঃ। যাও, ভেতরে যাও। এসময়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছ?'

গোরক্ষ বলল, 'ছোটবাবু বোধহয় বিয়ের খবরে খুশি হয়ে বন্ধুদের জানাতে গেছে।'

'ওর কোনও বন্ধু নেই। থাকতে পারে না।'

এইসময় বাইরে খুব চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল, 'নেহি যায়েগা। হাম কিসিসে কম নেহি হ্যায়। হঠ যাও।'

সতীশ রায় অবাক হয়ে সোজা হয়ে বসলেন, 'কে? আমার বাড়িতে এসে চেঁচাচ্ছে এত সাহস হল কার? গোরক্ষ দ্যাখো তো—।'

গোরক্ষকে উঠতে হল না। হরিপদ ধরাধরি করে নিয়ে এল, ছোটখোকার পা টলছে, দাঁড়াতে পারছে না। সতীশ রায় চমকে উঠলেন, 'একি! তুমি মদ খেয়েছ?'

'ইয়েস। খেয়েছি।'

'কোথায় পেলে মদ?'

'হরেকৃষ্ণের ভাটিখানায়।' জিজ্ঞাসা করল, 'বেকার কিনা? বললাম, নো। জিজ্ঞাসা করল, অ্যাডাল্ট কিনা? বললাম, ইয়েস। দিয়ে দিল।'

'ছি ছি ছি। তুমি চোলাই খেয়ে এসেছ? বাট হোয়াই? কেন?' চেঁচালেন সতীশ রায়।

'আমি, আমি দেবদাস হতে চাই।' টলল সত্যচরণ।

'দেবদাস? জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব?'

নাগেশ্বর জিজ্ঞাসা করল, 'কেন তুমি দেবদাস হবে ছোটখোকা?'

'কেন হব না? পাখিরা কথা বলে না এখানে, পাখি নেই বলে। আজ রাত্রে আমার পাখির বিয়ে হয়ে গিয়েছে।' কেঁদে ফেলল সত্যচরণ।

'পাখির বিয়ে? তোমার পাখি মানে? কে পাখি?'

গোরক্ষ মাথা নাড়ল, 'বুঝতে পেরেছি। ছোটখোকা, তুমি কি পোস্টমাস্টারের মেয়ে পাখির কথা বলছ?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল সত্যচরণ।

গোরক্ষ বলল, 'ওই যে বড়বাবু, মেয়েকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছে মাস্টার বিয়ে দিতে। এ হে হে! তোমাদের মধ্যে এত ইয়ে ছিল তার খবর এই নাগেশ্বর পর্যন্ত যখন জানত না তখন বলতেই হবে বড্ড চেপে রেখেছিলে।'

সতীশ রায় ছেলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়ি থেকে বেরুতে না, বাড়িতে কেউ আসতো না, তবু এসব হল কী করে?'

জবাব দিল না সত্যচরণ। সে দাঁড়াতে পারছিল না, হরিপদ ধরে রেখেছিল তাকে।

'জবাব দাও।'

'আজ্ঞে, মনে মনে।'

'এখন তুমি দেবদাস হতে চাও?'

'হুঁ।'

আচমকা খুব জোরে হেসে উঠলেন সতীশ রায়। হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমাদের আমি ম্যাদামারা দেখাতে চেয়েছিলাম হে, পারলাম না। তার বদলে ঢ্যামনা কাকে বলে দেখে নাও।'

ঘটকমশাই হঠাৎ উত্তেজিত হলেন, 'ও হো, তাই—।'

'চুপ। একদম চুপ।' তাঁকে ধমকালেন সতীশ রায়। তারপর বললেন, 'ওকে ভেতরে নিয়ে যা। ঘটকবাবু, মহাদেব সেনকে বলো, বিয়ের তারিখ তাড়াতাড়ি ঠিক করতে। ওর মা ওপরে চলে গিয়ে আমাকে অনেক শেকলে আটকে গেছেন। আমি পারছি না। যে পারবে তার তাড়াতাড়ি আসা দরকার।'

নাগেশ্বর বলল, 'কী পারবে বড়বাবু?'

'আমি সোজা আঙুলে ঘি তুলছি। উঠছে না। শুধু আঙুলে লেগে থাকছে। সে এসে বাঁকা আঙুলে ঘি তুলবে। নাও, শেষ করো। আমার রাতের খাওয়ার সময় হল।' সতীশ রায় গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে পড়লেন। ঘড়িতে নটা বাজল।

জেলাশাসক সময় দিতে পারলেন না। মুখ্যমন্ত্রী সফরে আসছেন, তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হবে কিন্তু তিনি তাঁর শুভেচ্ছাবাণী পাঠালেন। এস.ডি.ও., বি.ডি.ও., কোঅপারেটিভ সোসাইটির বড় কর্তারা ঠিক সময়ে এসে গেলেন।

ডুডুয়ার খেলার মাঠে মঞ্চ বাঁধা হয়েছে। বিকেলের আগেই হাজার দুয়েক মানুষ জড়ো হয়েছে সেখানে। মঙ্গল তার বাহিনী নিয়ে খুব ব্যস্ত সেই ভিড় সামলাতে। এস.ডি.ও. সাহেবকে প্রধান অতিথি ক'রে ডুডুয়ার তরুণ সঙ্ঘের ছেলেদের নিয়ে তৈরি কো-অপারেটিভের উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরু হল।

প্রত্যেক বক্তাই জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। আজ যখন দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে অথচ চাকরির সংখ্যা সীমিত তখন ডুডুয়ার তরুণ সম্প্রদায় হাপিত্যেশ করে বসে না থেকে রোজগার করার যে অভিনব পদক্ষেপ নিতে চলেছে তাকে সাধুবাদ জানালেন সবাই। কে বলে বাঙালি ব্যবসাবিমুখ? কে বলে বাঙালি পরিশ্রম করতে জানে না? এই কো-অপারেটিভের ছেলেরা প্রমাণ করে দেবে পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। তারা ডুডুয়া নদী থেকে মাছ ধরে বিক্রি করবে। এই কারণে ইতিমধ্যে তারা হাতেকলমে মাছধরা শিখেছে। ক্রমশ তারা ডেয়ারি ফার্ম, হাঁসমুরগির লালন এবং বিক্রি করবে। এর সবটাই হবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে নয়। কো-অপারেটিভের মাধ্যমে। কো-অপারেটিভের সব সদস্য যেহেতু তরুণ সঙ্ঘ ক্লাবের সদস্য তাই তাদের দায়িত্ব আজ থেকে অনেক বেড়ে গেল।

কো-অপারেটিভের পক্ষ থেকে বলতে উঠে মঙ্গল বলল, 'আজ যে নতুন দিনের সূচনা হচ্ছে তার জন্যে আমরা সব ভাবেই কৃতজ্ঞ বড়বাবুর কাছে। ডুডুয়ার সতীশ রায় যদি আমাদের স্বপ্ন দেখতে না সাহায্য করতেন তাহলে কিছুতেই আমরা এই কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠা করতে পারতাম না। উনি যতদিন আমাদের মধ্যে থাকবেন ততদিন ডুডুয়ার মানুষেরা সুখে থাকবেন।' বলেই সে চিৎকার করল, 'সতীশ রায়—।'

তার বন্ধুরা একসঙ্গে বলল, 'যুগযুগ জীও।'

মঙ্গল আবার চিৎকার করল, 'সতীশ রায়।'

এবার জনতা গর্জন করল, 'যুগ যুগ জীও।'

সতীশ রায় মঞ্চে ওঠেননি। প্রথম থেকেই তিনি বসেছিলেন প্রথম সারির একটি চেয়ারে। অনেক অনুরোধেও মঞ্চে উঠতে রাজি হননি।

এস.ডি.ও. সাহেব বলতে উঠলেন; 'আজ আমি এখানে আসতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। তরুণ সঙ্ঘের ছেলেরা শুধু ফুটবল খেলত। কিন্তু তাদের সামনে কোনও স্থির ভবিষ্যৎ ছিল না। শ্রীযুক্ত সতীশ রায়, যাঁকে আমরা ডুডুয়ার সতীশ রায় বলে জানি, তাদের ভবিষ্যৎ তৈরি করতে সাহায্য করলেন, এই কো-অপারেটিভ সতীশবাবুর মানসসন্তান। আমার আক্ষেপ, যদি দেশের প্রতিটি গ্রামে গঞ্জে এরকম মানুষ আরও থাকতেন তাহলে কী দারুণ ব্যাপার হত। সরকারি সাহায্যের দিকে না তাকিয়ে তিনি তরুণদের উৎসাহিত করেছেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে। আমরা এই উদ্যোগের নাম দিতে পারি, 'নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ান।'

আমি শ্রীযুক্ত সতীশ রায়কে অনুরোধ করছি কিছু বলার জন্যে—।'

চুপচাপ বসেছিলেন সতীশ রায়। পেছন থেকে নাগেশ্বর চাপাগলায় বলল, 'বড়বাবু, এস.ডি.ও. সাহেব ডাকছেন—।'

মঙ্গলরা কাছে চলে এল তাঁকে মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

মঞ্চে উঠে মাইকের সামনে দাঁড়ালেন সতীশ রায়। 'অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও যে মহামান্য অতিথিরা আমাদের কাছে এসেছেন বলে আমরা কৃতজ্ঞ। যে ছেলেরা আজ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে যাচ্ছে আপনাদের আশীর্বাদ তাঁদের পাথেয় হয়ে থাকবে। আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন বলে। নমস্কার।' ধীরে ধীরে মঞ্চ থেকে নেমে এসে মঙ্গলকে বললেন, 'এস.ডি.ও. সাহেবকে দিয়ে ফিতে কাটাও। তারপর ওদের সসম্মানে নিয়ে এসো আমার বাড়িতে। ওখানে চা খেয়ে তবে যাবেন।'

বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল মতির মা এবং এলোকেশী। তাঁকে দেখামাত্র মতির মা উধাও হল। হরিপদ গেট খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বারান্দায় চেয়ার দেব?'

'না। বসার ঘরে।' বারান্দায় উঠে তাকালেন তিনি এলোকেশীর দিকে, 'কিছু বলবে?'

'ক'জন আসবেন?'

'তিনজন আর ক্লাবের ছেলেরা। ধর জনা কুড়ি।' উত্তর দিলেন সতীশ রায়।

'দেখলে হরিপদদা, আমি ঠিক ধরেছিলাম।' হরিপদর দিকে তাকাল এলোকেশী।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইলেন সতীশ রায়।

'আপনি তো বলেননি কতজন খাবে, আন্দাজে কুড়িজনের জন্যে খাবার করেছি।'

'কী খাবার?'

'ফিশফ্রাই, সন্দেশ আর চা।' এলোকেশী মুখ নিচু করে বলল।

'ফিশফ্রাই? এখানে কোথায় পেলে?'

'আজ্ঞে সবই ও নিজে বানিয়েছে।' হরিপদ জানাল।

'তাই নাকি? দ্যাখো, এরা শহরের লোক, ওসব অনেক খেয়েছেন। ভালো না হলে! তার চেয়ে লুচি বেগুন ভাজা দিলেই হত।'

'ছোটখোকা দুটো খেয়েছে। বলেছে ভালো লেগেছে।'

'অ। সন্দেশ কোত্থেকে আনলি হরিপদ? এখানকারটা তো মুখে দেওয়া যায় না।'

'সন্দেশও ওই বানিয়েছে বড়বাবু।' হরিপদ জবাব দিল।

'বাঃ। তুমি তো বেশ গুণী মেয়ে। হরিপদ, মতির মাকে চটপট আমার কাছে আসতে বল।' সতীশ রায় নিজের ঘরে চলে গেল।

চেয়ারে বসে হাসলেন তিনি। আজ তাঁর খুব ভালো লাগছে। শেষপর্যন্ত ছেলেগুলোকে যদি উৎসাহ দিয়ে যাওয়া যায় তাহলে একটা কাজের কাজ হবে। মতির মা দরজায় ঘোমটা টেনে দাঁড়াতেই তার দিকে তাকালেন তিনি, 'সে কোথায়?'

'আজ্ঞে, ঘরে ছিল।'

'ছিল মানে?'

'এখন মাঠের মেলায় গিয়েছে।'

'মেলা? এখানে মেলা কোথায় দেখলে?'

'ওই যে সবাই আপনার জয়ধ্বনি দিল!'

'হুঁঃ। কখন গেল?' সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেলা ভাঙার পরে?'

মতির মা নিচু গলায় বলল, 'প্রথম প্রথম তো—।'

'দু-দুটো ফিশফ্রাই খেয়েছে?'

'আজ্ঞে আমি বলেছিলাম সন্দেশ বেশি করে খেতে, ওটা একটা—।'

'ওকে আজ রাত্রে খেতে দেবে না।'

'না খেলে যে ওর পেটে ব্যথা হয়।'

'হয় হোক। হরিপদকে দিয়ে ডাকিয়ে আনো। এখনই। একটু পরে এই বাড়িতে গণ্যমাণ্য লোকজন আসবেন। ওকে বলবে আমি চাই ও নিজের হাতে খাবারের প্লেটগুলো নিয়ে আসবে। বুঝতে পেরেছ? যাও।'

তখনই বাইরে চেঁচামেচি শুরু হল। সতীশ রায় বারান্দায় এসে দেখলেন, ছোট একটা ভিড় এস.ডি.ও. সাহেবকে নিয়ে এগিয়ে আসছে।

হাতজোড় করে আপ্যায়ন করলেন সতীশ রায়। তিনজনকে ভেতরের বসার ঘরে বসিয়ে মঙ্গলকে দায়িত্ব দিলেন ক্লাবের ছেলেদের বারান্দায় বসিয়ে জলখাবার খাওয়াতে।

এস.ডি.ও. সাহেব বললেন, 'আমি শুধু এক কাপ চা খেতে পারি এবং সেটা চিনি এবং দুধ ছাড়া। ডাক্তারের নির্দেশ মেনে চলছি।'

সতীশ রায় বললেন, 'তা কী হয়? আপনারা প্রথম এই বাড়িতে এলেন, একটু ফিশফ্রাই আর সন্দেশের ব্যবস্থা করেছি—।'

'অসম্ভব! দোকানের জিনিস খেতে নিষেধ করেছেন ডাক্তার।' এস.ডি.ও বললেন।

'আপনাকে দোকানের জিনিস আমি খাওয়াচ্ছি না। হরিপদ।' ডাকলেন সতীশ রায়।

হরিপদ বোধহয় তৈরি ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ট্রে নিয়ে ঢুকল, পেছনে চোরের মত সত্যচরণ। একটু অবাক হলেন সতীশ রায়। কিন্তু ছেলেকে না দেখার ভান করে বললেন, 'বাড়িতে তৈরি, তেমন ভালো তো হওয়ার কথা নয়। খারাপ লাগলে খাবেন না।'

বি.ডি.ও. বললেন, 'সন্দেশ যে দোকানের নয় তা বোঝা যাচ্ছে।'

কো-অপারেটিভের কর্তা বললেন, 'এরকম পাড়াগাঁয়ে শহরের খাবার আশা করা বৃথা।'

এস.ডি.ও. চামচ দিয়ে একটুকরো ফিশফ্রাই তুলে মুখে পুরে বললেন, 'কী বলছেন মিস্টার রায়? এ জিনিস বাড়িতে তৈরি হয়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বাঃ। এ তো বড় হোটেলের নামী ফ্রিশফ্রাইকেও হার মানিয়েছে।'

ততক্ষণে বাকি দুজন মুখে তুলেছেন ফিশফ্রাই। তাঁরাও খুব প্রশংসা করলেন। এস.ডি.ও. বললেন, 'আপনার কাজের-লোক নিশ্চয়ই এটা বানায়নি? আপনার স্ত্রী?'

'তিনি গত হয়েছেন পনেরো বছর আগে। এটিকে রেখে গেছেন।' ছেলেকে দেখিয়ে দিলেন সতীশ রায়।

বি.ডি.ও. বললেন, 'ও! কি নাম তোমার?'

'সত্যচরণ।'

'তুমিও তো কো-অপারেটিভের মেম্বার?'

'না।'

সতীশ রায় বললেন, 'পরিশ্রমে ওর খুব আপত্তি।' তারপর হাসলেন, 'এই কো-অপারেটিভ অত্যন্ত গরিব পরিবারের উদ্যোগী ছেলেদের নিয়ে তৈরি। ও মেম্বার হলে একজনকে বঞ্চিত করা হত।' হরিপদ চা নিয়ে ঢুকছে দেখে সতীশ রায় বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি চা আনতে গেল কেন? এঁদের আরও একটা করে

ফ্রাই এনে দে।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনজনই আপত্তি করলেন। একটা খেয়েই তাঁদের পেট ভরে গেছে। ওঁরা চায়ের কাপে হাত দিলে সত্যচরণ বলল, 'আমি যাই?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই।' বি.ডি.ও. মাথা নাড়লেন।

'আপনার এই ছেলে কী করে?' কো-অপারেটিভের কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন।

'এতদিন কিছু করত না, এখন আমাকে ব্যবসায় সাহায্য করছে।'

'ওরে ব্বাবা! তাহলেই তো হয়ে গেল। অন্য কিছু এর কাছে লাগে না। পড়াশুনা করেছে কতদূর?' ভদ্রলোকের দ্বিতীয় প্রশ্ন।

'হায়ার সেকেন্ডারির পর আর পড়েনি।'

'অ। ব্যাচেলারস ডিগ্রিটা নিয়ে রাখলে ভালো করত। আজকাল তো সব মেয়েই বিয়ের আগে বি.এ. পাশ করে নেয়।'

এস.ডি.ও. বললেন, 'আচ্ছা এবার উঠি। খুব ভালো লাগল এখানে এসে।'

বাকিরাও একই কথা বললেন।

তখনও সন্ধ্যা নামেনি। ঘটকমশাই-এর ফোন এল।

সতীশ রায় খেঁকিয়ে উঠলেন, 'তুমি কি হে? আর সময় পেলে না? এই সন্ধের মুখে ফোন করলে? নিশ্চয়ই কোনও খবর দেবে?'

'আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারিনি, পরে করব?' ঘটকমশাই নার্ভাস।

'করেছ যখন বলেই ফেলো।'

'সেনমশাই যদি আগামীকাল বিকেলে আসতে চান তাহলে অসুবিধে হবে?'

'এভাবে হুট করে বললে কার সুবিধে হয়?'

'কিছু মনে করবেন না বড়বাবু, আমরাও কিন্তু হুট করে গিয়েছিলাম।'

হজম করলেন সতীশ রায়, 'অ। বেশ আসতে বলো। বারোটার মধ্যে যেন আসেন।'

'আর একটা কথা—।'

'আবার কি হল?'

'পাত্রী বলছে তার নাকি আপনাকে খুব পছন্দ হয়েছে।'

'হেঁ হেঁ। মেয়েটি বড় ভালো।'

'কিন্তু আপনার ছেলেকে দেখে যদি তার দাদুর পছন্দ না হয় তাহলে ওই সোনার চেনটা তো ফেরত দিতে হবে—।'

'তাই নাকি? অপছন্দ হতে পারে? অবশ্য না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।'

'তাই তার ইচ্ছে সে দাদুর সঙ্গে আসবে, যে বাড়িতে তাকে ভবিষ্যতে থাকতে হবে, যাকে বিয়ে করবে তাকেও স্বচক্ষে দেখে যাবে।' ঘটকমশাই ঢোক গিললেন, 'যদি দুজনেরই অপছন্দ হয় তাহলে চেন কালই ফেরত দিয়ে যাবে।'

'মহাদেব সেন এই আবদার মেনে নিয়েছেন?'

'নাতনি অন্ত প্রাণ তো, না মেনে উপায় নেই। তাছাড়া বাড়িতে কোনও ছেলে নেই যে সঙ্গে নিয়ে আসবেন পাত্র দেখতে।'

'আমি তো ছেলে থাকা সত্ত্বেও নিয়ে যাইনি।' সতীশ রায় বললেন, 'বেশ, তাই হবে। আসতে বলো ওঁদের।'

রিসিভার নামিয়ে একটু ভাবলেন সতীশ রায়। নাঃ। হাজার হোক এই বংশের মা-মরা ছেলে। শক্ত প্রশ্ন করলে একেবারে ল্যাজেগোবরে হবে। একটু সতর্ক করে রাখা দরকার। তিনি চিৎকার করলেন, 'হরিপদ।'

হরিপদ এসে দাঁড়াতেই বললেন, 'ছোট খোকাকে ডাকো।'

'এখন খাচ্ছে।'

'খাচ্ছে? এই একটু আগে দু-দুটো ফ্রাই পেঁদিয়েছে গুণনাথ?'

'ফ্রাই তো শেষ হয়ে গেছে, তাই এখন সন্দেশ খাচ্ছে।'

'শেষ হয়ে গেছে মানে? আমি বাড়ির কর্তা, আমি খেলাম না আর তোমরা সব সাবাড় করে দিলে। এলোকেশী কোথায়?'

'কাঁদছে।'

'সেকি? কেন?'

'ছোট খোকার জন্যে কেন আর একটা ফ্রাই আলাদা লুকিয়ে রাখেনি বলে মতির মা বকেছিল, তাই।'

'অসম্ভব, ওই বুড়িকে এবাড়ি থেকে না তাড়ালে ইডিয়েটটার মেরুদণ্ড সোজা হবে না। যাও। গিয়ে বলো এক্ষুনি এখানে আসতে।' সতীশ রায় সিগারেট ধরালেন। ধরাতেই তাঁর চোখ চলে গেল দেওয়ালে টাঙানো স্ত্রীর ছবির দিকে। বিড় বিড় করলেন, 'এক্সাইটমেন্ট! তুমি ঠিক বুঝবে না।'

সত্যচরণ এসে দাঁড়াল।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সতীশ রায় বললেন, 'শোন আগামীকাল বিকেল

তিনটের মধ্যে ভালো জামাকাপড় পরে বাড়িতেই অপেক্ষা করবে। কোথাও যাবে না। তুমি যে হাবা-বোবা-কালা-অন্ধ নও তা দেখতে তোমার ভাবী দাদাশ্বশুর আসবেন। আমার কথা কি বুঝতে পারছ?'

'এখন কেন?' বিড়বিড় করল সত্যচরণ।

'তার মানে?'

'মায়ের মৃত্যুমাস—।'

'তোমার মা বাংলা মতে মাস বিচার করতেন। মৃত্যুমাস বাংলামতে শেষ হয়ে গিয়েছে। বাংলা ইংরাজি একসঙ্গে করলে মাস পঁয়তাল্লিশ দিনে শেষ হয়। আমার সঙ্গে চালাকির চেষ্টা করবে না।' সতীশ রায় বললেন।

'কী জিজ্ঞাসা করবে?'

'এনিথিংগ। তৈরি হয়ে থেকো। আমি চাই জিজ্ঞাসা করা মাত্রই ফটাফট উত্তর দেবে তুমি। আচ্ছা, যদি জিজ্ঞাসা করে ছেলেদের জুতো কত রকমের হয়? কী জবাব দেবে তুমি?'

'জু-জুতো?' হকচকিয়ে গেল সত্যচরণ। তারপর নিজের পায়ের দিকে তাকাল, 'হাওয়াই।'

'আর?'

'হ্যাঁ, বুটজুতো মানে শু। চটি জুতো। স্ট্র্যাপ দেওয়া জুতো। আর—আর কেড্‌স।' বলে মাথা নাড়ল সত্যচরণ।

'কেডস? কেন? নাগরাজুতোর নাম শোননি?' খেঁকিয়ে উঠলেন সতীশ রায়।

'আজ্ঞে না।'

'শোননি?'

'আপনি তো আমাকে কিনে দেননি--।'

'গেট আউট। বিদায় হও সামনে থেকে।' চেঁচিয়ে উঠলেন সতীশ রায়, 'এলোকেশীকে এঘরে আসতে বলো।'

সত্যচরণ লাফ দিয়ে বিদায় নিল।

একটু পরেই এলোকেশী এল, চোখ মুখ লাল, ফোলা ফোলা।

'শোন। তোমার ফিশফ্রাই-এর খুব প্রশংসা করেছেন সাহেবরা। তুমি যে এত ভালো করতে পারবে তা আমিও ভাবিনি। হ্যাঁ, কাল বিকেলে ওই সত্যচরণকে দেখতে পাত্রীপক্ষ আসছেন। তাঁদের কী ভাবে আপ্যায়ন করবে তা

তুমিই ঠিক করো।'

'কজন আসবেন?' এলোকেশীর গলা ধরা ধরা।

'সেরকম কিছু বলেনি। তিন কি চারজন, তার বেশি নয়।'

'লুচি বেগুনভাজা, তরকারি, মুরগির মাংস আর পায়েস?'

'খুব ভালো কথা। কিন্তু প্রথম পাতে তোমার ফিশফ্রাই চাই।'

'একটু বেশি হয়ে যাবে না?'

'হলে হবে। সবাই ভালো বলছে কিন্তু আমি স্বাদ পেলাম না। না না, তোমার কোনও দোষ নেই। এস্টিমেটের থেকে লোক বেশি হয়ে গেলে তুমি কী করবে। এক-একজন দু-দুটো করে খেয়েছে নাকি?'

'না। তা ঠিক নয়। লোক বেশি হয়ে গিয়েছিল।'

'অ। তাহলে কাকে ফেরাবে? সত্যি তো। সত্য কটা খেয়েছে?'

'ভাজার সময় দুটো খেয়েছিল। পরে আবার খেতে চেয়েছিল, নেই বলে দিতে পারিনি।' গলা ভেঙে গেল, ঠোঁট টিপলে এলোকেশী।

'আর তাই মতির মা তোমাকে যাচ্ছেতাই করে বলেছে। সেটা শুনে তুমি কাঁদতে বসে গেলে। কেন? তুমি জিজ্ঞাসা কেন করলে না, ও দু-দুটো খেয়েছে, বড়বাবুকে একটাও দিতে পেরেছি যে ওর জন্যে রাখব?' সতীশ রায় বললেন, 'এত সামান্য কারণে তুমি কাঁদতে বসে গেলে।'

'ছেলেটা খেতে চাইল আর আমি দিতে পারলাম না—।' কথা শেষ করল না এলোকেশী। চমকে তার দিকে তাকালেন সতীশ রায়। তার মানে এলোকেশী মতির মায়ের বকুনির জন্যে কাঁদেনি, সত্যচরণকে ফ্রাই বেশি খাওয়াতে না পেরে মনের কষ্টে কেঁদেছে! অদ্ভুত কাণ্ড।

সন্ধ্যাবেলায় আজও আসর বসল। কো-অপারেটিভের মিটিং নিয়ে কথা হচ্ছিল।

নাগেশ্বর বলল, 'ওঃ। আপনি, যাকে বলে ফাটিয়ে দেওয়া, তাই দিয়েছেন। এত প্রশংসা এত জয়ধ্বনি অথচ তার জবাবে আপনি বেশি কথা না বলে শুধু ধন্যবাদ জানালেন। শোনার মতো ব্যাপার।' মাথা নাড়ল সে।

'আরশোলার পাখা আছে বলে তাকে কেউ পাখি বলে না নাগেশ্বর।'

গোরক্ষ বলল, 'শিখে কী করবে? কেউ কি তোমার নামে জয়ধ্বনি দেবে

এই জীবনে?'

সতীশ রায় বললেন, 'ছাড়ো তো। আমি মরছি নিজের জ্বালায়?'

'কী হয়েছে বড়বাবু। আমরা থাকতে আপনি জ্বলবেন, এ তো ভালো কথা না।' নাগেশ্বর বলল, 'ওরা শুনলাম বুধরার মাছধরা শুরু করবে। সেদিন দেওখালির হাট। মঙ্গলে উষা বুধে পা, যথা ইচ্ছে তথা যা। বুধবার শুরু করছে, চিন্তার কারণ নেই।'

'মাছ ধরা নিয়ে আমি চিন্তিত তা তোমাকে কে বলল?'

'তাহলে?'

'কাল পাত্রীপক্ষ পাত্র দেখতে আসবেন।' সতীশ রায় বললেন।

'কী দরকার? আপনাকে দেখেছে তারপর পাত্রকে দেখার কী দরকার? হিরের আংটি বেঁকা হলেও দোষ কী!' নাগেশ্বর বলল।

'না নাগেশ্বর।' গোরক্ষ মাথা নাড়ল, 'মেয়ে কোন্ ছেলের হাতে পড়ছে তা যে কোনও বাবা মা জানতে চান। বাবা নেই, দাদু তো চাইবেনই।'

'তাহলে আসছে যখন আসুক। চিন্তার কী আছে?' নাগেশ্বর বলল।

'আছে। স্বয়ং পাত্রী আসছে তার দাদুর সঙ্গে।' সতীশ রায় বলল।

'সেকি? এটা কী করে সম্ভব?' গোরক্ষ বলল।

'বাপের জন্মে শুনিনি পাত্রী বিয়ের আগে হবু শ্বশুরবাড়ি দেখতে আসে! এ কেমন পাত্রী?' নাগেশ্বর উত্তেজিত।

'তাহলে স্বীকার করছ, চিন্তার কারণ আছে।' সতীশ রায় বললেন।

'অবশ্যই। আমাদের পাত্র তাদের দেখতে গেল না আর পাত্রী আসবে? লোকে কী বলবে? না না, আপনি রাজি হবেন না।' গোরক্ষ বলল।

'ঘটকবাবু ফোন করে বলতে আমি রাজি হয়ে গেলাম।' সতীশ রায় বললেন।

গোরক্ষ বলল, 'চিন্তা করে দেখলে এটা হতে দেওয়া উচিত। আমাদের দেশের রেওয়াজ হচ্ছে ছেলে মেয়ে দেখতে যাবে। সেইসঙ্গে মেয়ের বাড়ি, মেয়ের আত্মীয় স্বজনদেরও দেখে আসবে। অথচ সে মেয়ের বাড়িতে গিয়ে বিয়ের পর থাকছে না। কিন্তু মেয়ে এসে থাকবে শ্বশুরবাড়িতে। তারই তো বিয়ের আগে এসে সবকিছু দেখে যাওয়া উচিত।'

'এত স্বাধীনতা মেয়েদের দেওয়া হয়নি। যাক গে, পাঁচ কান না করলেই হল। আসুক পাত্রী।' নাগেশ্বর প্রসঙ্গটা পালটাল, 'ও হ্যাঁ। শুনলাম আজ নাকি

আপনার বাড়িতে এত ভালো ফিশফ্রাই হয়েছিল যা এখানকার ছেলেরা কখনও খায়নি!'

সতীশ রায় হাসলেন, 'ঠিক শুনেছ। এস. ডি. ও. সাহেব নিজে প্রশংসা করেছেন।'

'আচ্ছা! তা হরিপদর উচিত ছিল আমাদের এইসময় টেস্ট করতে দেওয়া।' গ্লাসে চুমুক দিল নাগেশ্বর, 'ও হরিপদ।'

'ডেকে লাভ নেই নাগেশ্বর। গোটা কুড়ি ফিশফ্রাই বিকেলেই শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি পর্যন্ত তার স্বাদ পাইনি।' সতীশ রায় বললেন।

হরিপদ ঢুকল, 'আজ্ঞে, ডেকেছেন?'

'কী হে! হরিপদ। এ তোমার কী ব্যবহার? আমাদের জন্যে তো দূরের কথা, খোদ বড়বাবুর জন্যেও ফিশফ্রাই রাখোনি?' নাগেশ্বর জিজ্ঞাসা করল।

'খুব ভুল হয়ে গিয়েছে।'

'তা ওটা বানাল কে?' গোরক্ষ তাকাল।

'এলোকেশী।'

'অ্যাঁ। সে এত জানে?'

সতীশ রায় বললেন, 'ঠিক আছে। এলোকেশীকে বল কাল যখন সেনবাবুদের জন্য খাবার করবে তখন এদের কথা মাথায় রাখতে।'

হরিপদ ভেতরে গেল।

রান্নাঘরের সামনে বেঞ্চিতে বসে বাইরের অন্ধকার দেখছিল এলোকেশী। হরিপদ এসে তাকে ঘটনাটা জানাল। জিভ কাটল এলোকেশী, 'ছি ছি।'

'কাল করে দিয়ো। পালিয়ে যাচ্ছে না তো সময়!'

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল এলোকেশী, 'ওঁরা কতক্ষণ থাকবেন হরিপদদা?'

'কতক্ষণ আর! আটটা পর্যন্ত। বড়জোর।'

'যাই হাত চালাই।' রান্নাঘরের দিকে এগোল এলোকেশী।

'তার মানে?' হরিপদ বুঝতে পারছিল না ও কী করতে যাচ্ছে।

'ফ্রাই-এর মশলা বেশি ছিল, মাছ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন চটপট ডিম সেদ্ধ করে ওই দিয়ে ডেভিল তৈরি করে দেব।'

'ডেভিল?' হরিপদ শব্দটা প্রথম শুনল।

ওপাশের ঘর থেকে সত্যচরণ বেরিয়ে এল, 'কী বানাচ্ছ এলোদি?'

'ডেভিল।' হাসল এলোকেশী।

'বাঃ। আমার জন্যে দুটো থাকে যেন!'

মতির মা শুনতে পেয়ে এগিয়ে এল, 'ডেভিল মানে কী?'

'ডেভিল মানে শয়তান।' সত্যচরণ হাসল।

'সেকি? তুমি বাড়িতে শয়তান বানাবে? আর সেগুলো খোকাকে খাওয়াবে? কক্ষনো নয়। ও খোকা, তুমি ওসব খেয়ো না। কাল তোমাকে দেখতে আসছে, আজ ওসব খেয়ে পেট খারাপ হলে কী হবে?' মতির মা মাথা নাড়তে লাগল।

কথা না বাড়িয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল এলোকেশী।

সবে দু-গ্লাস শেষ হয়েছে, সতীশ রায় ঘড়ি দেখলেন। হরিপদ তিনটি প্লেট আর চামচ নিয়ে ঘরে এল, প্লেটে দুটো করে গরম ডেভিল।

সতীশ রায় বললেন, 'ওটা কী?'

হরিপদ বলল, 'আজ্ঞে, এলোকেশী বলল এর নাম ডেভিল।'

গোরক্ষর মুখ উদ্ভাসিত হল, 'ডিমের ডেভিল? এ জিনিস বহু বছর আগে শিলিগুড়ির রেলের ক্যান্টিনে খেয়েছিলাম। দেখি দেখি।' প্লেট তুলে নিয়ে চামচে একটা টুকরো তুলে মুখে দিল গোরক্ষ। চোখ বন্ধ করল একটু। তারপর মাথা নেড়ে চিবোতে চিবোতে বলল, 'খাসা, ও বড়বাবু, এ দেখছি রন্ধনে দ্রৌপদী।'

নাগেশ্বর চামচের বদলে হাতেই তুলে নিয়ে কামড়াল, 'ফার্স্টক্লাশ।'

অতএব সতীশ রায় চামচ ব্যবহার করলেন, মুখে দিয়ে বুঝলেন খুব উপাদেয় হয়েছে। খেতে খেতে বললেন, 'কখন বানাল?'

'এই তো এইমাত্র।'

'অবাক কাণ্ড! ও হ্যাঁ। খোকা যেন এখন না খায়, রাত্রের খাবারের সঙ্গে দিতে বলবে। বুঝলে?' সতীশ রায় খেতে খেতে বললেন।

'আজ্ঞে! এতক্ষণে ওর দুটো খাওয়া হয়ে গিয়েছে।' হরিপদ মুখ নিচু করল।

নাগেশ্বর বলল, 'আচ্ছা, খেয়ে নিক। এ জিনিস আমিও দশটা খেতে পারি।'

'দশটায় পাঁচটা ডিম। খেয়ে হাসপাতালে নিজেই আগেভাগে চলে যেয়ো।' গোরক্ষ বলল, 'নিজের বয়সটার কথা আর কবে খেয়াল করবে?'

সতীশ রায় ঘড়ি দেখলেন। আজ কিছু বলার আগেই নাগেশ্বর উঠে দাঁড়াল, 'বড়বাবু, কাল কখন আসব?'

'হঠাৎ।' সতীশ রায় তাকালেন।

'না অতিথিরা আসবেন, আপনি একা মানুষ!'

'এসো। ওঁরা চারটের মধ্যে আসবেন।' সতীশ রায় উঠে দাঁড়ালেন।

দুপুরের একটু পরেই অবনীদা এসে গেলেন। সতীশ রায়ের খেয়াল ছিল না। ওকে বাসস্টপ থেকে নিয়ে এল মঙ্গলরা। অবনীদা যে আসবেন তা ওদের মনে ছিল।

অবনীদা বললেন, 'চলে এলাম। আজকের রাতটা এখানেই থাকব। কাল বিকেলের পর ফিরব। তার মানে তিনবেলা হাতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, প্র্যাকটিসের পর তোমরা কিছু খাও তো?'

মঙ্গল মাথা নিচু করল।

'তাহলে তো চলবে না। পরিশ্রম করবে, ঘাম বেরুবে শরীর থেকে অথচ শরীরকে কিছু দেবে না। এটা কি ঠিক? কেন? এখানে এখন পেয়ারা পাওয়া যাচ্ছে নিশ্চয়ই। পেয়ারা কেটে বিট নুন দিয়ে রেখে দাও, সঙ্গে একটা করে হাফবয়েলড ডিম। প্র্যাকটিসের পরেই খেয়ে নেবে সবাই।'

কেউ একজন নিচু গলায় বলল, 'এখানে ডিম ছয়টাকা জোড়া।'

সতীশ রায় বললেন, 'ওটা নিয়ে তোদের ভাবতে হবে না। রোজ এখান থেকে ডিমসেদ্ধ নিয়ে যাস।'

'তাহলে এক কাপ করে দুধও দিয়ে দেবেন।'

'বেশ। কিন্তু অবনীদা, আজ আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারছি না। আমার বাড়িতে কয়েকজন আসছেন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে। তাদের সঙ্গেই থাকতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। আপনি মাঠে গিয়ে কী করবেন? শুধু রাতে থাকার ব্যবস্থাটা করে দিলেই আপনার দায়িত্ব শেষ।' অবনীদা ঘড়ি দেখলেন।

সাড়ে তিনটের সময় অবনীদাকে নিয়ে ছেলেরা মাঠে চলে গেল। হরিপদকে ডাকলেন সতীশ রায়, 'সে কি করছে?'

'আজ্ঞে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে।'

'আঃ। বই পড়ার অনেক সময় পরে পাবে, এখন তৈরি হতে বলো।'

মাথা নেড়ে ভেতরে যাচ্ছিল হরিপদ, সতীশ রায় আবার ডাকলেন, 'প্যান্ট

শার্ট পরতে বলবে। ধোপ ভাঙা।'

ঠিক চারটের সময় গাড়িটা এসে দাঁড়াল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সতীশ রায় অবাক হয়ে দেখলেন গোরক্ষ আর নাগেশ্বর কোত্থেকে যেন উড়ে এসে গেটের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্রাইভারের পাশ থেকে নেমে ঘটকমশাই পেছনের দরজা খুলে দিতেই মহাদেব সেন নেমে ওদের নমস্কার করলেন। তাঁর পেছনে নেমে দাঁড়াল প্রতিমা। নীল সালোয়ার কামিজ, মাথায় ওড়নাটা জড়ানো। বেশ ভালো দেখাচ্ছে।

নাগেশ্বর বলল, 'স্বাগতম্। আজ লক্ষ্মীর পা পড়বে এই বাড়িতে।'

গোরক্ষ বলল, 'লক্ষ্মীর আগমনে শ্রী ফুটবে এই বাড়িতে।'

মহাদেব সেন বললেন, 'না না। ডুডুয়ার সতীশ রায়ের ওপর লক্ষ্মীর আশীর্বাদ রয়েছে অনেকদিন থেকেই।'

সতীশ রায় নেমে এসেছিলেন বাগানে। বললেন, 'আরে, গেট খুলে দাও।'

নাগেশ্বর চটপট গেট খুলে দিতে তিনি বললেন, 'নমস্কার। আসুন, আসুন। পথে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?'

'না। ঘটকমশাই পথ চিনিয়ে নিয়ে এলেন।' মহাদেব সেন বললেন।

'এসো মা। এই হল আমার মাথা গোঁজার জায়গা। পাড়াগাঁয়ে থাকি, তোমার পছন্দ হবে কিনা জানি না। ওই যে বাগানের যেখানে শেষ সেখানে গেলেই দেখতে পাবে ডুডুয়া নদী। বেশি চওড়া নয়, তবে জল আছে। এসো।'

প্রতিমা বলল, 'এনারা?'

'ও। ইনি গোরক্ষ, ইনি নাগেশ্বর। বহুকাল একসঙ্গে আছি আমরা।'

প্রতিমা এগিয়ে গেল প্রণাম করতে। ওরা লাফিয়ে সরে গেল 'না না' বলে।

সতীশ রায় হাসলেন, 'থাক থাক। এসো ভেতরে এসো। আসুন।'

বাইরের ঘরে ঢুকে সতীশ রায় অবাক হলেন। পরিপাটি সাজানো হয়েছে ঘরটা। টেবিলে কভার দেওয়া হয়েছে, ফুলদানিতে ফুল। হরিপদ বা মতির মায়ের কর্ম যে নয় তা বুঝতে পারলেন।

'বসুন। বসুন। বসো তোমরা।'

মহাদেব সেন নাতনিকে নিয়ে বসলে খানিকটা দূরের চেয়ারে গোরক্ষ এবং নাগেশ্বর বসল।

মহাদেব সেন বললেন, 'সুন্দর বাড়ি!'

'আমার পিতৃদেব করে গিয়েছেন। আমি মাঝে মাঝে মেরামত করি। প্রথমে

একটু শরবৎ-জাতীয় কিছু বলি?' সতীশ রায় তাকালেন।

'না না। যাওয়ার আগে একটু চা খেয়ে যাব।'

'সেকি! আমার বাড়িতে প্রথম এসে শুধু চা খেয়ে যাবেন নাকি?'

'বউভাতে এসে খাব।' মহাদেব সেন হাসতে হাসতে বলতেই ঘটক মশাই হাসলেন, 'আপনার কথাই ফিরিয়ে দিচ্ছেন উনি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা!' হজম করলেন সতীশ রায়।

'তা আপনার ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?' মহাদেব সেন জিজ্ঞাসা করলেন।

সতীশ রায় ডাকলেন, 'হরিপদ!'

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পাওয়া গেল, 'আজ্ঞে।'

'খোকাকে এঘরে আসতে বলো!'

'এই একটুখানি দেরি হবে।' নিবেদন করল হরিপদ। সতীশ রায় বিরক্ত হয়ে তাকাতে চটজলদি বলল, 'একটু বাথরুমে গিয়েছেন।'

'কী আশ্চর্য! আর সময় পেল না। গিয়ে বলো তাড়াতাড়ি আসতে।'

হরিপদ চলে গেলে প্রতিমা বলল, 'আপনি রাগ করবেন না। এরকম হয়।'

মহাদেব সেন বলল, 'দিদিমণি, তোমার মা-দিদা এখানে যে শর্তে আসতে দিয়েছেন সেটা ভুলে গেলে চলবে না।'

'ওমা, তাই তো, ভুলেই গিয়েছিলাম।' গম্ভীর হল প্রতিমা।

'শর্তটা কী জানতে ইচ্ছে করছে।' সতীশ রায় হাসলেন।

মহাদেব সেন বললেন, 'ওকে মুখ বন্ধ করে থাকতে বলেছে। বড়জোর একটা কী দুটো কথা বলতে পারে।' মহাদেব সেন জানালেন।

'না না। তুমি স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারো। কী বলছিলেন যেন—।'

প্রতিমা দাদুর দিকে একবার তাকাল, তারপর বলল, 'আমারও হয়েছিল।'

'কী হয়েছিল?'

'যেদিন প্রথম আমাকে দেখতে পাত্রপক্ষ এসেছিল সেদিন হঠাৎ পেট মুচড়ে উঠেছিল। ওরা গাড়ি থেকে নামামাত্র আমি বড় বাথরুম ছুটেছিলাম।' পরিষ্কার বলল প্রতিমা।

'সেটা প্রথমবারই হয়েছিল, আর হয়নি।' মহাদেব সেন বললেন, 'আপনার ছেলেকে নিশ্চয়ই আমরাই প্রথম দেখতে এসেছি?'

নীরবে মাথা নাড়লেন সতীশ রায়।

নাগেশ্বর বলল, 'নার্ভাস হয়ে গেলে ওরকম হয়।'

'ভয়েও হয়। ভয়ের চোটে বাহ্যি করে ফেলে অনেকে।' গোরক্ষ বলল।

'আঃ। আর কোনও প্রসঙ্গ নেই?' মৃদু ধমক দিলেন সতীশ রায়।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল প্রতিমা, 'যাঃ। খুব ভুল হয়ে গিয়েছে।'

মহাদেব সেন অবাক হলেন, 'কী হল?'

'ওগুলো গাড়ি থেকে নামানো হয়নি।'

মহাদেব সেনের মনে পড়তেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সতীশ রায় হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'আপনি যাচ্ছেন কেন? কী নামাতে হবে বলুন, হরিপদ যাচ্ছে।'

ঘটকমশাই বললেন, 'কাউকে যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি।' তিনি বেরিয়ে গেলে মহাদেব সেন বললেন, 'দয়া করে বাড়ি ফিরে গিয়ে একথাটা বলো না, তাহলে খুব বকুনি খেতে হবে।'

দুটো বড় বড় মুখবন্ধ হাঁড়ি নিয়ে ঘটকমশাই ফিরে এসে টেবিলের ওপর রাখলেন। মহাদেব সেন বললেন, 'ওদুটো ভেতরে পাঠিয়ে দিন।'

'তাই বলুন। কী দরকার ছিল এসবের!'

'রাজভোগ বোধহয়। মালবাজারের রাজভোগ খুব বিখ্যাত।' নাগেশ্বর বলল।

'না না। রাজভোগ নয়। ক্ষীরের মণ্ডা, নরম পাকের তালশাঁস সন্দেশ। শুভকাজে নাকি মাটির পাত্র ব্যবহার করতে হয় তাই—।'

এইসময় সত্যচরণকে নিয়ে হরিপদ এল। মহাদেব সেন বললেন, 'এসো দাদু, এসো। তোমার নামই তো সত্যচরণ?'

নীরবে মাথা নাড়ল সত্যচরণ।

'বসো বসো।' সস্নেহে বললেন মহাদেব সেন।

মহাদেব সেনের একপাশে প্রতিমা বসেছিল। অন্যপাশের চেয়ারে সত্যচরণ বসল।

'শুনলাম তুমি স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে ভর্তি হতে চাওনি?' মহাদেব সেন তাকালেন।

'কলেজে পড়েও তো বাবার ব্যবসায় বসতে হবে। তার চেয়ে বাড়িতেই পড়া ভালো।'

'ও। তাই বলো। তা বাড়িতে তুমি কী পড়ছ?'

'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সব লেখা পড়া হয়ে গিয়েছে, এখন শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের বই পড়ছি।' সত্যচরণ দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল।

'বাঃ। খুব ভালো। তুমি কি লেখালেখি করো?'

'হুঁ। চেষ্টা করি। কিন্তু—।' থেমে গেল সত্যচরণ।

'হ্যাঁ, বলো।' মহাদেব উৎসাহ দিলেন।

'যাদের কাছে আমি অনুপ্রেরণা পেতে চাই তারা আমাকে ছেড়ে চলে যায়। অনুপ্রেরণা ছাড়া কি ভালো লেখা হয়!' সত্যচরণ বিমর্ষ মুখে বলল।

হাঁ হয়ে ছেলের কথা শুনছিলেন সতীশ রায়। এসব কী বলছে ছোকরা? এত কথা যে ও বলতে পারে তাই জানা ছিল না তাঁর। হঠাৎ তিনি শঙ্কিত হলেন। ও কি পোস্টামাস্টারের মেয়ের কথা ভেবে কথাগুলো বলল? ফস্ করে সেই মেয়ের নাম না বলে বসে। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আপনার যদি ওকে অন্য প্রশ্ন করার থাকে তাহলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন!'

'না। কী আর প্রশ্ন করব! ভদ্র বিনয়ী ছেলে।' মহাদেব সেন হাসলেন।

'তাহলে আমি যাই।' উঠতে যাচ্ছিল সত্যচরণ।

'বসো।' মৃদু ধমকালেন সতীশ রায়। তারপর গলা পালটে বললেন, 'মা, তোমার যদি কোনও প্রশ্ন করার থাকে করতে পারো।'

মাথা নাড়ল প্রতিমা, 'আমাকে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।'

'কে নিষেধ করেছে?' সতীশ রায় অবাক।

'মা, দিদিমা। মুখ না খুলে শুধু চোখ দিয়ে দেখতে বলেছে ওরা।'

'এ কেমন কথা? তাহলে তো মহা মুশকিল।' সতীশ রায় বললেন।

প্রতিমা তার দাদুর দিকে তাকাল, 'কী করব?'

'ঠিক আছে।' মহাদেব সেন মাথা নাড়লেন।

'তুমি আবার ওদের বলে দেবে না তো?'

'অন্যায় কিছু জিজ্ঞাসা না করলে বলব না।'

প্রতিমা সত্যচরণকে দেখার চেষ্টা করল। মাঝখানে মহাদেব সেন বসে থাকায় ঝুঁকে দেখতে হচ্ছে।

সতীশ রায় ছেলেকে বললেন, 'একটু এগিয়ে নাও চেয়ারটাকে। অত আড়াল খোঁজার কী দরকার?'

বেজার মুখে চেয়ার এগিয়ে এসে বসল সত্যচরণ দেওয়ালের দিকে মুখ করে।

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যচরণ নামটা আপনার খুব ভালো লাগে, না?'

দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে সত্যচরণ জবাব দিল, 'জানি না।'

'জানেন না কেন?'

'কখনও ভাবিনি। গুরুজনরা ভালো বলেই নামটা রেখেছিলেন।'

'আপনি কী খেতে ভালোবাসেন?'

সত্যচরণ চুপ করে থাকল। বোঝা গেল সে ভেবেই বলেছে।

'পাঁচটা খাবারের নাম বলুন।'

'ভাত, মাছ, মাছের ফ্রাই, সন্দেশ, ক্ষীর।'

'এখানে বুঝি মাছের ফ্রাই পাওয়া যায়!'

'এলোদি করে দেয়।'

'এলোদি কে?' প্রতিমা সতীশ রায়ের দিকে তাকাল।

সতীশ রায় বলেন, 'একজন ভদ্রঘরের বিধবা মহিলা। আমাদের রান্নার দায়িত্ব নিয়েছেন।'

মহাদেব সেন বললেন, 'দিদিমণি, এবার ওকে যেতে দাও, অনেক প্রশ্ন হয়ে গেছে।'

'ওমা! প্রশ্ন কোথায় করলাম! আমি তো সাধারণ কথা জানতে চেয়েছি। আচ্ছা, আপনি বলুন, আমি কি ওঁকে প্রশ্ন করেছি?' আবার সতীশ রায়ের দিকে তাকাল প্রতিমা।

'না না।' মাথা নাড়লেন সতীশ রায়।

'তাহলে এবার প্রশ্ন করি। আপনাকে আমি দুটো প্রশ্ন করব। মোগল সম্রাটদের নাম নিশ্চয়ই জানেন—।'

কথা শেষ করতে না দিয়ে সত্যচরণ বলল, 'বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গির, শাজাহান, ঔরঙ্গজেব—।'

'বাঃ। আমি কিন্তু প্রশ্নটা না করতেই আপনি প্রশ্ন ভেবে নিয়েছেন। যাক গে। আপনি যখন ঔরঙ্গজেবের চার পূর্বপুরুষের নাম জানেন তখন নিশ্চয়ই আপনার চার পূর্বপুরুষের নাম জানা। বলুন তো!' প্রতিমা তাকাল।

মাথা নামাল সত্যচরণ, তারপর বলল, 'বাবা, দাদু।'

'ওঁদের কোনও নাম নেই বুঝি— !' প্রতিমা থামিয়ে দিল।

'শ্রীযুক্ত সতীশ রায়, স্বর্গীয় সত্যসিন্ধু রায়—।' চোখ বন্ধ করল সত্যচরণ। আর কোনও নাম মনে পড়ছিল না।

'আপনি ওঁকে বলে দিন।' প্রতিমা অনুরোধ করল সতীশ রায়কে।

'ও জানলে তো বলবে। মোগল সম্রাটদের নাম মুখস্থ রেখেছে কিন্তু—। যাক গে। সাতকড়ি রায়, শ্রদ্ধানন্দ রায়।'

'দ্বিতীয় প্রশ্ন। আপনি আপনার বাবাকে ব্যবসায় সাহায্য করেন। তার মানে রোজগারের ব্যাপারে বাবার ওপর নির্ভরশীল। আচ্ছা ধরুন, বিয়ের পর আপনার বাবা আপনাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আমাকে তো আপনার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে হবে। তখন আমরা কোথায় থাকব, কীভাবে খাওয়া দাওয়া করব?'

'বাবা আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না।' অন্যদিকে তাকিয়ে বলল সত্যচরণ।

'—আচ্ছা, যদি দেন—।'

'দিলে তো এতদিনে দিতেন।' মুখ নামাল সত্যচরণ।

'জবাব দাও। তোমাকে বেরিয়ে যেতে বলিনি বলে কোনদিন বলব না একথা ভাবার কোনও কারণ নেই।' বলেই প্রতিমার দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা নাড়লেন।

'একটা কিছু করতে হবে।'

'ব্যাস। এটাই শুনতে চেয়েছিলাম। আপনার মনে হচ্ছে এখানে বসে থাকতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। যান, ভেতরে যান।'

প্রতিমা কথা শেষ করতেই মহাদেব সেনকে নমস্কার করে ভেতরে চলে গেল সত্যচরণ। সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বুঝলে?'

'বেশ নিরীহ।' বলেই হেসে ফেলল প্রতিমা।

'হুম্। কিন্তু তোমাকে শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। এমন টাইট দেবে যাতে চোখে সরষের ফুল দ্যাখে।' সতীশ রায় হাসলেন।

'না না।' মহাদেব সেন বললেন, 'একে মা মনসা, আপনি তার ওপর—।'

'তুমি আমাকে মনসা বললে দাদু? মনসা তো ভগবান।' প্রতিবাদ করল প্রতিমা।

হরিপদ ট্রে নিয়ে এল। তাতে নানান রকমের খাবার সাজানো। মাছের বড়া, ফিশফ্রাই, সন্দেশ, রসগোল্লা।

মহাদেব সেন মাথা দোলালেন, 'এর সবকটাই আমার কাছে নিষিদ্ধ বস্তু।'

'কেন?' সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'ভাজা খাওয়া বারণ হার্টের জন্যে। মিষ্টি নিষিদ্ধ ব্লাডসুগারের জন্যে।'

'ও।' সতীশ রায় ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন।

'হরিপদদা।' দরজার বাইরে থেকে এলোকেশীর গলা ভেসে এল।

হরিপদ দ্রুত বাইরে চলে গেল। ফিরে এল আধ মিনিটের মধ্যেই। এসে বলল, 'আজ্ঞে, চিনিছাড়া সন্দেশ খেতে কি আপত্তি আছে?'

'চিনি ছাড়া সন্দেশ? সে তো কলকাতার বড় দোকানে পাওয়া যায়।' মহাদেব সেন বললেন, 'মিষ্টি না থাকলে সন্দেশ কি সন্দেশ থাকে?'

সতীশ রায় বললেন, 'এলোকেশী বলেছে যখন তখন নিয়ে এসো।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সন্দেশ চলে এল। গোটা চারেক।

ইতস্তত করে মুখে দিলেন মহাদেব সেন, চোখ বন্ধ করে চিবিয়ে বললেন, 'চমৎকার মিষ্টি যা আছে তা বোঝা যাচ্ছে না। কে বানাল?'

'আজ্ঞে এলোকেশী।'

'বাঃ।' দুটো সন্দেশ খেয়ে নিলেন মহাদেব সেন।

হরিপদ এবার প্রতিমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা, আপনি—।'

'এম্মা! আমাকে আপনি বলছেন কেন? আমি কত ছোট। আপনি সত্যচরণবাবুকে কি আপনি বলেন?'

'না না। এইটুকু থেকে দেখে আসছি, তাই—।'

'আমাকে যদি এ বাড়িতে এসে থাকতে হয় তাহলে আপনি বলা চলবে না। হুঁ। আমি একটা ফ্রাই খাব। আর কিছু নয়।' প্রতিমা বলল।

খাওয়া শেষ হলে সতীশ রায় হরিপদকে ডেকে বললেন, 'একবার এলোকেশীকে এখানে আসতে বলো।'

মিনিট দুয়েক বাদে এলোকেশী এল। সতীশ রায় অবাক হয়ে দেখলেন শাড়ি-জামা এবং চুল বাঁধায় একটু সাজ সাজ ভাব এনেছে এলোকেশী। ঘরে ঢুকে নমস্কার করল হাতজোড় করে।

'এই হল এলোকেশী।'

'খুব ভাল সন্দেশ খেলাম।' মহাদেব সেন বললেন।

'ফ্রাই-ও।' প্রতিমা বলল।

সতীশ রায় বললেন, 'মা, তুমি তো আমাদের বাড়ি দেখতে এসেছ। যাও, এলোকেশীর সঙ্গে ঘুরে দ্যাখো বাড়িটা।'

উঠে দাঁড়াল প্রতিমা। বলল, 'যাই।'

ওরা বেরিয়ে যেতে মহাদেব সেন বললেন, 'নাতনির সব ভালো কিন্তু কবে যে ম্যাচিওরিটি আসবে কে জানে!'

'আপনি ভুল করছেন। আজকালকার ছেলেমেয়েরা এমন সহজভাবে জীবনকে গ্রহণ করতে জানেই না। ম্যাচিওরিটি মানে মুখ বন্ধ করে যদি প্যাঁচ কষা হয় তাহলে আমি চাইব সেটা যেন ওর কখনই না আসে।' সতীশ রায় বললেন।

'এইটে বাবুর শোওয়ার ঘর।' সতীশ রায়ের বেডরুমের সামনে দাঁড়িয়ে বলল এলোকেশী।

'বাবু কে?' প্রতিমা তাকাল।

'তোমার ভাবী শ্বশুরমশাই।' এলোকেশী হাসল।

'ওমা। তাঁকে তুমি বাবু বলো নাকি?'

'এখানে, এই ডুডুয়াতে সবাই ওঁকে বড়বাবু বলে।'

'বড়বাবু শুনতে ভালো। বাবু বোলো না।'

'এইটেতে অতিথি এলে থাকে।' হরিপদ বলল।

'ও।'

'ওদিকে আরও দুটো খালি ঘর আছে।'

'ও।'

'এই যে উঠোন। উঠোনের ওপাশে রান্নাঘর, এদিকের ছোট ঘর দুটোর একটায় মোতির মা আর আমি থাকি, অন্যটায় হরিপদদা।'

'মোতির মা কে?'

'মোতির মা খোকাবাবুর জন্ম থেকে আছে। ওর মা মারা যাওয়ার পর থেকেই খোকাবাবু যেমন মতির মা ছাড়া চলতে পারে না তেমনি মতির মা খোকাবাবুর কোনও দোষ দেখতে পায় না। খুব ভালোবাসে ওকে।' কথা শেষ করে এলোকেশী ডাকল, 'মতির মা, ও মতির মা!'

সলজ্জ ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল মতির মা। পরিষ্কার থান পরনে, মাথায় ঘোমটা। এলোকেশী বলল, 'এই হল মতির মা।'

প্রতিমা দ্রুত এগিয়ে নিচু হয়ে প্রণাম করতেই মতির মা হাউমাউ শব্দ করে লাফিয়ে সরে গিয়ে বলতে লাগল, 'পাপ হবে, মহা পাপ হবে।'

'তার মানে? কার পাপ হবে?' প্রতিমা অবাক।

'আমার।' ঘোমটা টেনে দিল সামনে মতির মা।

'কেন?'

'আমি এ বাড়িতে কাজ করি, বাড়ির বউ যে হতে যাচ্ছে সে কেন আমাকে

প্রণাম করবে? আমারই প্রণাম করা উচিত।' হাত নিচু করে এগোল মতির মা।

'আপনি কি পাগল?' হেসে ফেলল প্রতিমা। 'আমার মায়ের চেয়ে কতবড় আপনি! ছি ছি ছি।'

হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল মতির মা। এলোকেশী কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওকি! কাঁদছ কেন? কী হল?'

কান্না জড়ানো গলায় মতির মা বলল, 'দুশ্চিন্তায় ঘুমাতে পারতাম না। আজ যে কী ভালো লাগছে। এলো, আমার খোকাবাবু ভাগ্য করে এসেছিল, নইলে এমন মেয়ে এই ঘরে আসে!'

'যাচ্চলে! তুমি এখনও তোমার খোকাবাবুর কথা ভাবছ।' এলোকেশী হেসে ফেলল, 'কার সঙ্গে বিয়ে হবে, সেই বউ কী রকম এই ভেবে খাওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল মতির মায়ের। তোমাকে দেখে শান্তি পেয়েছে।

'খুব নরম মন গো, কবিতা লেখে তো।' মতির মা বলল।

'অ্যাঁ! কবিতা লেখে নাকি!'

'না না, আগে লিখত না। এই এক মাস হল শখ হয়েছে। বিয়ের পর যদি নিষেধ করা হয় তাহলে লিখবে না।' মতির মা বলল।

প্রতিমার খুব মজা লাগছিল মতির মায়ের কথা শুনে।

এলোকেশী বলল, 'সেসব পরে হবে। আগে ওকে বাড়িটাকে দেখতে দাও। এই হল রান্নাঘর। এটা খাবারের জায়গা। আর ওপাশে খোকাবাবুর ঘর। মানে এখন পর্যন্ত ঘরটার ওই নাম, পরে তোমার ঘর হয়ে যাবে। ঘরটা দেখবে নাকি?'

মতির মা বলল, 'তোর কি বুদ্ধি লোপ পেয়েছে! এখনও কোন সম্পর্ক তৈরি হয়নি, এই অবস্থায় কি ওর ওই ঘরে যাওয়া উচিত?'

প্রতিমা হাসল; 'সম্পর্ক তৈরি না হলে কি যাওয়া যায় না?'

'তুমি তো এখনও কুমারী, আইবুড়ো ছেলের ঘরে যাওয়া ঠিক নয়!' বেশ গম্ভীর মুখে কথাগুলো বলল মতির মা।

'বেশ। তাহলে ওই ঘরে যাব না। তোমাদের বাড়িতে ঠাকুরঘর কোথায়?'

'ছিল। খোকার মা মারা যাওয়ার পর বড়বাবু বাড়িতে পুজো বন্ধ করে দিয়েছেন। ওই ঘর তালাবন্ধ। তুমি এসে যদি পারো তাহলে তালা খুলিয়ো।'

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে মনে পড়ে যাওয়াতে প্রতিমা মতির মাকে বলল, 'তোমার খোকাবাবু শুনলাম পরিশ্রম করে না। ওকে কি খাইয়ে দাও তুমি?'

'না না।' প্রতিবাদ করল মতির মা, 'নিজের হাতে খায়। মা-মরা ছেলে তো, বেশি পরিশ্রম করলে যদি কিছু হয়ে যায়—, তাই!'

'একি কথা! ব্যাটাছেলে ন্যাকাচৈতন্য হয়ে থাকবে নাকি! এতদিন যা করেছে করেছে, এরপর ওসব চলবে না বলে দিয়ো।'

সতীশ রায়ের গলা ভেসে এল, হরিপদকে ডাকছেন।

হরিপদ বলল, 'খোঁজ পড়েছে, এবার ও ঘরে যেতে হয়।'

ঘরে ঢুকতেই সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন দেখলে?'

'ভালো।'

'হরিপদরা যেমন রেখেছে তেমন আছে।'

মহাদেব সেন বললেন, 'আজ তাহলে চলি।'

সতীশ রায় বললেন, 'আপনি আমার পিতৃতুল্য। এই বাড়িতে আপনার নাতনিকে পেলে আমি শুধু একটি মেয়ের অভাব থেকে বঞ্চিত হব না, আপনার মতো মানুষকে মাথার ওপর পেয়ে ধন্য হব।'

গাড়িতে ওঠার আগে মহাদেব সেন বললেন, 'সবই ভালো কিন্তু মনে একটু খুঁত রয়ে গেল।'

'কীরকম?' সতীশ রায় উদ্বিগ্ন হলেন।

'একমাত্র পুত্রের বিয়ে দিচ্ছেন অথচ কোনও দাবিদাওয়া নেই—।'

'কে বলল নেই? এই যে, ঘটকবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার দাবি মেটাতে কীরকম নাকানিচুবুনি খেয়েছেন—।' সতীশ রায় এতক্ষণ চুপচাপ থাকা ঘটকমশাইকে দেখিয়ে দিলেন।

ওঁদের সঙ্গে ঘটকমশাইকেও চলে যেতে দেখে খেয়াল হল সতীশ রায়ের। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকিয়ে মানিকজোড়কে দেখতে পেলেন।

'কী ব্যাপার? তোমরা তো আমাকে অবাক করলে হে!'

'কেন বড়বাবু, কোন ত্রুটি হয়েছে কি?' গোরক্ষ বলল।

'না না। তোমরা এতক্ষণ মুখ বন্ধ করে বসেছিলে কী করে? এ তো তোমাদের স্বভাব নয়!' হাসলেন সতীশ রায়।

'কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বড়বাবু।' নাগেশ্বর বলল।

'কেন?'

'মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। আহা, চোখে মুখে কথা ঠিকরে উঠেছিল মায়ের। সুন্দরী তো বটেই কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর কথা বলার ভঙ্গি।'

নাগেশ্বর বলতে বলতে মাথা দোলাচ্ছিল।

'একটুও জড়তা নেই, যেন নিজের বাড়িতে এসেছে। আপনার ভয়ে ডুডুয়ায় বাঘ আর গরু একসঙ্গে জল খায়---।' বলে থেমে গেল গোরক্ষ।

'ওর সামনে আপনি, মানে আপনাকে, মায়ের পাশে ছেলের মতো দেখাচ্ছিল। নাগেশ্বর বলল, 'এ মেয়ে এলে সংসার সুখের হবে।'

গোরক্ষ বলল, 'কথাই আছে, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।'

'হুম্। সেটাই তো ভাবছি। আমাদের সন্ধ্যাহ্নিক বন্ধ করে দিতে পারে এ বাড়িতে পা দিয়েই। ঝাড়ামোছা যখন শুরু করবে তখন কি আর আহ্নিককে রেহাই দেবে।' বললেন সতীশ রায়।

'সেকি!' চিৎকার করে উঠল নাগেশ্বর।

'একটা বাচ্চা মেয়ে এসে এতদিনকার অভ্যেস বন্ধ করে দেবে? একি মেনে নেওয়া যায়? না না, আপনি মহাদেব সেন মশাইকে জানিয়ে দিন!' গোরক্ষ গম্ভীর গলায় বলল।

'কী জানাব? পাত্রীর হবু শ্বশুর প্রতি সন্ধ্যায় দু-পেগ মদ্যপান করে স্যাঙাতদের সঙ্গে, বিয়ের পর সেটা মেনে নিতে হবে মেয়েকে? পাগল। ওই মেয়ের ওপর কিছু চাপিয়ে দিলে যে তা মানবে না।' সতীশ রায় কথা বলার সময় দেখতে পেয়েছিলেন মঙ্গলরা অবনীবাবুকে নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে। তিনি গেট খুলে বললেন, 'আসুন আসুন।'

অবনীদা ভেতরে ঢুকে বললেন, 'এরা ফাঁকিবাজ নয়। সেদিন যা যা দেখিয়ে গিয়েছিলাম তা একেবারে ঠিকঠাক করতে পারছে। গুড। কিন্তু আমাকে এখনই শহরে ফিরে যেতে হবে।'

'সেকি! আপনার তো আজ রাত্রে ডুডুয়ায় থাকার কথা।'

'ঠিক। কিন্তু যাচ্ছি একজন কমপাউন্ডারকে ধরে নিয়ে আসতে। ফার্স্ট বাসে চলে আসব। তোমরা তার আগে শুরু করে দিয়ো।' অবনীদা বললেন।

'কম্পাউন্ডার কেন?'

'প্রেসার মাপাবে। প্রত্যেকের নামে আলাদা আলাদা কার্ড হবে। মেডিক্যাল কার্ডে প্রেসার, পালস-বিট কত লেখা থাকবে, ব্লাড গ্রুপও লিখে রাখতে হবে। ফুটবলে চোট পাওয়া তো রোজকার ব্যাপার, রক্তের গ্রুপ জানা না থাকলে অ্যাকসিডেন্টের সময় সমস্যা হয়। পালস-বিট যার ষাট পঁয়ষট্টি স্পোর্টসম্যান হিসেবে তার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।' অবনীদা বললেন।

'শুনেছিলাম পালসবিট বাহাত্তর থাকাটাই নর্মাল।

'সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে। যদি কোনও কারণে পালস-বিট আশি নব্বই হয়ে যায় তাহলে তাদের অসুস্থ বলা হয়। ওইসময় বেশি দৌড়াদৌড়ি ক্ষতিকর। কিন্তু যার পালস-বিট ষাট তার পক্ষে পনেরো বেশি হলেও কোন অসুবিধে হয় না। আচ্ছা, আমার ব্যাগটা—।'

'থাক না ওটা। আপনি তো কাল সকালেই আসছেন।'

'ও। তাহলে থাক। চলি।' অবনীদা হাঁটতে লাগলেন বাস-রাস্তার দিকে। সঙ্গে ছেলেরা।

মঙ্গলরা চেয়েছিল ওরা যখন মাছ ধরবে তখন সতীশ রায় যেন উপস্থিত থাকেন। ইতিমধ্যে দুটো ডিঙ্গি নৌকো, টানা জাল, হাতজাল কিনে দিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে ধরা মাছ নিয়ে যাওয়ার মজবুত ঝুড়িও।

মাথা নেড়ে বলেছিলেন, না, তোমরা এবার সাবালক হও। আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এবার হাতেকলমে কাজটা তোমাদের করতে হবে। আমি ওখানে গিয়ে দাঁড়ালে লোকে ভাববে আমার ব্যবসা। কাজে নামলে তোমরা নিজেরাই এগিয়ে যেতে পারবে। আরও কী করলে ভালো লাভ হতে পারে তা আবিষ্কার করবে।'

বেলা নটা নাগাদ সতীশ রায় খবর পেলেন ছেলেরা বাইশ কেজি মাছ ধরেছে। সবই বড় বড় রুই অথবা কাতলা। স্থানীয় বাজারে যার দাম ষাট টাকা কেজি। কিন্তু সেগুলো চালানি, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আসে। চারটে সাইকেলের পেছনে ব্যাগে ভরে ওরা কাছাকাছি হাটে গিয়ে বিক্রি করে দিল পঞ্চাশ টাকা কেজিতে। মাছওয়ালা ওই মাছ স্বচ্ছন্দে পঁয়ষট্টি টাকা কেজিতে বিক্রি করতে পারবে।

বেলা বারোটা নাগাদ মঙ্গলরা এল দেখা করতে। সতীশ রায় তখন স-মিলে। কাঠচেরাই-এর একটা করাত তখন শব্দ করছে। মঙ্গল এগারো'শ টাকা তাঁর সামনে রাখতেই তিনি রেগে গেলেন, 'একি! এখানে টাকা রাখছ কেন?'

'আজকে এই দাম পেয়েছি—।'

'ভালো কথা। তোমাদের কী বলেছিলাম? অর্ধেক নিজেদের মধ্যে ভাগ করে বাকিটা ব্যাঙ্কে জমা দাও। ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট তো খুলেছ!'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে।'

'আজ্ঞে নৌকা, জালের দাম--।'

'ছয়মাস পরে কত লাভ হল দেখি, তারপর হিসেব করব। ও হ্যাঁ, শুনলাম, তোমরা নাকি রুইকাতলা ছাড়া মাছ ধরোনি, ছোট মাছ ওঠেনি?'

'উঠেছিল। প্রথম দিন তাই--।'

'ছোট মাছেরও খদ্দের আছে এবং তাদের দাম বেশি বলে লাভও বেশি। আর টার্গেট করবে যাতে তিরিশ কেজি বড় আর দশ কেজি ছোট ধরতে পারো। যাও। আমাকে কাজ করতে দাও। ও হ্যাঁ, অবনীদা কবে আসবেন?'

'আজই।'

'তাহলে তোমরা তিনটের মধ্যে মাঠে তৈরি থাকবে। শহর থেকে যে লোকটা খেলা শেখাতে আসবে তাকে যেন হাত গুটিয়ে বসে থাকতে না হয়।'

ছেলেরা চলে গেলে ম্যানেজারবাবু বললেন, 'সদর থেকে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন, 'বললেন, উনি অবনীবাবুর ভাই।'

'তাই নাকি। সে কোথায়?' ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সতীশ রায়।

স্বাস্থ্যবান এক প্রৌঢ়কে সঙ্গে নিয়ে ম্যানেজার ফিরে এলো। সতীশ রায় বললেন, 'নমস্কার। বসুন।'

'আমি নির্মল, আমার দাদা অবনী আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।'

'হ্যাঁ। খুব খুশি হয়েছি আপনি এসেছেন বলে। অবনীদার কাছে শুনেছি আপনি দীর্ঘদিন চা-বাগানের দায়িত্ব সামলে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন!'

'হ্যাঁ। এখন বেশির ভাগ চা-বাগানে কাজের পরিবেশ চলে গেছে। আমি আত্মসম্মান বিক্রি করতে রাজি নই বলে বাড়িতে ফিরে এসেছি।' নির্মল বললেন।

'এই কারণেই মনে হয়েছিল আপনার সঙ্গে কথা বলা যায়। দেখুন, চা-বাগান সম্পর্কে আমার ধারণা ভাসা ভাসা। যেতে আসতে দেখি কিন্তু ব্যবসা সম্পর্কে কৌতূহলী হইনি। শুনেছি এখন কেউ কেউ ফ্যাক্টরি ছাড়া শুধু চায়ের বাগান তৈরি করে পাতা বিক্রি করছেন। আমার ম্যানেজারবাবু এ ব্যাপারে আগ্রহী। আপনি বলুন তো ব্যবসা হিসেবে এর সম্ভাবনা কতটুকু?'

নির্মলবাবু হাসলেন, 'আমি কখনই ভাবিনি প্রপার অর্গানাইজেশন ছাড়া চা গাছ তৈরি, পাতা প্লাকিং, ফ্যাক্টরিতে প্রোসেসিং করা সম্ভব। প্রত্যেকটা ডিভিশন এ ওর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এখন অন্য অনেক শিল্পের মতো চা-ও বিভক্ত হতে চলেছে। হ্যাঁ, আপনি সেরা জাতের পাতা উৎপাদন করে যাঁদের কারখানা

আছে তাঁদের কাছে বিক্রি করতে পারেন। কিন্তু কোন্ জমিতে চা-গাছ লাগাচ্ছেন সেটা দেখতে হবে। আমি শুনেছি খড়্গপুরের মতো গরম জায়গায় নাকি চা-চাষ নিয়ে পরীক্ষা চলছে।'

'কীরকম জমি হলে ভালো হয়?'

'সামান্য ঢালু যাতে জল দাঁড়ায়ে না।'

'তারপর?'

'প্রথমে মাটি তৈরি করা, গাছ লাগানো, নার্সারি করা। প্রচুর কাজ। কতটা জমিতে চাষ করতে চান সেই বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রথমে সয়েল টেস্ট করা দরকার। মাটির ওপর গাছের প্রাণশক্তি নির্ভর করে। টেস্ট রিপোর্ট পেলে বলা যেতে পারে কী করা উচিত।'

'সাধারণত গাছ লাগাবার কতদিন পরে পাতা তোলা যায়?'

'চা গাছ দু-ভাবে করা যায়। বীজ থেকে অথবা বড় গাছের ডাল কেটে। দুটোই মাটিতে পুঁতে একবছর অপেক্ষা করতে হয়। এই অবস্থাটাকে বলে নার্সারি। একবছর পরে নার্সারি থেকে তুলে জমিতে পোঁতা হয়। বীজের গাছ পাতা তোলার জন্যে উপযুক্ত হয় চারবছর বাদে, কিন্তু কলমের গাছের পাতা বছর দুয়েক পরেই তোলা যায়।' নির্মলবাবু জানালেন।

'তার মানে অন্তত আড়াই বছর অপেক্ষা করতে হবে?' সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন। 'তারপরে রিটার্ন পাব। দেখুন, এ ব্যাপারে আমি আগ্রহী কিন্তু যদি আপনি দায়িত্ব নেন তাহলেই।' সতীশ রায় বললেন।

'আপনি আমাকে জানেন না। আমার বায়োডাটা দ্যাখেননি। তবু আমার ওপর দায়িত্ব দিচ্ছেন কেন?' নির্মলবাবু অবাক হলেন।

'দেখুন ল্যাংড়া আমের গাছে আর যাই হোক ফজলি ফলবে না। আপনি অবনীদার ভাই, ইচ্ছে করলেও ততটা খারাপ করতে পারবেন না যতটা করলে আমার ক্ষতি হয়। আপনি একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করুন। শুরুর সময় কী ধরনের কতটা জমি দরকার। আড়াই বছরে কী কী খরচ কোন্ কোন্ বাবদ করতে হবে? চায়ের পাতা বিক্রি শুরু হলে বাৎসরিক খরচের বিনিময়ে কত লাভ হতে পারে—এসব বিশদে তৈরি করে ফেলতে কতদিন সময় লাগবে?'

'বেশিদিন লাগার কথা নয় কিন্তু তার আগে জমি দেখা দরকার। এক এক জমিতে এক এক ধরনের পাতা হয়। জমি কী অবস্থায় আছে, সেটাকে বাগানে পরিণত করতে কত খরচ হবে তা না দেখলে বোঝা যাবে না।' নির্মলবাবু বললেন।

সতীশ রায় একমুহূর্ত ভাবলেন। তারপর বললেন, 'চলুন।'

ঘণ্টাদেড়েক ধরে গাড়ি নিয়ে চক্কর দিলেন ওঁরা। খাস জমি, ধানচাষের যোগ্য নয়, যেসব জমি অবহেলায় পড়ে আছে সেগুলো দেখে নির্মলবাবু ফিরে গেলেন। কথা দিলেন পনেরো দিনের মধ্যে প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করে দেবেন।

দিন ঠিক হয়ে গেল।

হাতে বেশি সময় নেই। ডুডুয়ার সতীশ রায়ের ছেলের বিয়ে বলে কথা। কাকে ছেড়ে কাকে বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না তিনি। নাগেশ্বর প্রস্তাব দিল, 'ডুডুয়ার প্রত্যেক বাড়ির একজনকে আসতে বললেও তো কয়েক হাজার হয়ে যাবে। অত লোক বউভাতের দিন কোথায় বসে খাবে? তার চেয়ে ঝাড়াই বাছাই করে পাঁচশো লোককে নেমন্তন্ন করাই ভালো।'

সতীশ রায় সেই কর্মটি করতে গিয়ে দেখলেন কোনভাবেই হাজারের নিচে নামাতে পারছেন না। চিঠি ছাপা হল। সদরের বড়কর্তাদের নিজে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এলেন। আত্মীয়স্বজনরা চলে এলেন দিন-দুই আগেই। বাড়িতে ভিয়েন বসল। নাগেশ্বর এবং গোরক্ষ চব্বিশঘণ্টাই পড়ে আছে এ বাড়িতে, তদারকি করতে। সদর থেকে নামকরা রান্নার ঠাকুর আনা হল। পরিবেশনের দায়িত্ব নিল তরুণ সংঘের ছেলেরা। ইতিমধ্যে মাছ বিক্রি করে তারা ভালো অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে।

অবনীদার কোচিং-এ ভালো ফল হয়েছে। তরুণ সংঘ গত তিনটি ম্যাচের দুটো জিতেছে, একটি ড্র করেছে। অবনীদা জেলার সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্টে নাম এনট্রি করিয়েছেন। সেখানে খেলার যোগ্যতা অর্জনের খেলায় জিতে গেছে তরুণ সংঘ। কিন্তু মঙ্গলরা বুঝতে পারছিল অবনীদা বেশি জোর দিচ্ছেন দশ থেকে তেরোর বাচ্চাদের ওপর। ওরা অন্ধের মতো অবনীদার কথা শুনছে এবং বেশ চটপট রপ্ত করছে খেলার কায়দা। অবনীদা বলে গেছেন বড়দের সঙ্গে ছোটদের একটা ম্যাচ তিনি খেলাবেন। যে গোল দেবে তাকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেবেন তিনি।

বাড়ির পেছনে ডুডুয়ার ধারে বসে সত্যচরণ ভেবে পাচ্ছিল না তার কী করা উচিত। ঘন ঘন বুক নিংড়ে শ্বাস বেরিয়ে আসছে। যদি সে সাঁতার না জানতো তাহলে ডুডুয়ার এই কালো জলের তলায় চুপচাপ শুয়ে পড়ত।

হঠাৎ এলোকেশীর গলা কানে এল, 'ওমা! তুমি এখানে?'

সত্যচরণ কোন কথা বলল না।

এলোকেশী বলল, 'ওদিকে দর্জি তোমার বিয়ের পাঞ্জাবি নিয়ে এসেছে। চল, পরে দেখবে ঠিক হয়েছে কিনা।'

'আমি কোথাও যাব না।' গম্ভীর গলায় বলল সত্যচরণ।

'অ্যাঁ? একি কথা! আজ বাদে কাল বিয়ে, জলের ধারে বসে থেকে অসুখ বাধাবে নাকি? ওঠ, চল।'

সত্যচরণ এলোকেশীর দিকে তাকাল, 'এলোদি, তুমি আমাকে বাঁচাও।'

'বাঁচাব? কেন? কী হয়েছে তোমার?'

'আমি বিয়ে করতে পারব না।'

'সেকি? তোমার কি বউ পছন্দ হয়নি?'

'না। তা নয়। কিন্তু আমার পক্ষে কি বিয়ে করা উচিত? আমি তো আর, মানে, আমার মনের কৌমার্য তো নেই।'

'অ।'

'বিশ্বাস করো, পাখি ছাড়া আমি কিছুই ভাবতে পারছি না।'

'যাকে নিয়ে ভাবছ সে তো তার স্বামীর সঙ্গে বেশ মজায় আছে।'

'থাকুক। ওর শরীর নিয়ে আমি চিন্তা করি না। ওর মন তো আমার মন নিয়ে গিয়েছে।' শ্বাস ফেলল সত্যচরণ।

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কতদূর এগিয়েছিলে?'

'মানে?'

'ওঃ। চুমুটুমু খেয়েছিলে?' চোখ ছোট করল এলোকেশী।

'এম্মা! নাঃ।' রক্ত জমল সত্যচরণের গালে।

'ও। হাত ধরেছিলে?'

মাথা নাড়ল সত্যচরণ, 'না। দূর থেকে দেখেছি। পাখিও দেখেছিল।'

'তার মানে কথাবার্তাও হয়নি?'

'মুখে হয়নি, মনে মনে হয়েছে।'

'আর কয়েকমাস পরে যখন তোমার পাখি বাপের বাড়িতে আসবে বাচ্চার জন্ম দিতে তখনও এসব কথা বলতে পারবে?'

'পারব। সারাজীবন পারব।'

'তাহলে ওই মেয়েটার কী হবে? বেচারা তোমাকে দেখতে এতদূরে এল। সমস্যাটা খুব শক্ত। একটু ভেবে দেখি। এখন চল, পাঞ্জাবিটা পরে দেখবে। নইলে

বড়বাবুর কানে গেলে কুরুক্ষেত্র বাধবে।' এলোকেশী সত্যচরণের হাত ধরে টেনে নিয়ে এল বাড়িতে।

সত্যচরণকে দেখে মতির মা দৌড়ে এল, 'উঃ। কোথায় গিয়েছিলে? এইসময় কেউ বাড়ির বাইরে যায়?'

'আমার জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না।' নিচু গলায় বলল সত্যচরণ।

'আঃ! চুপ। এখন এসব কথা বলতে নেই। বাড়ি ভর্তি লোক। নাও, পাঞ্জাবি পরে দ্যাখো—।' মতির মা অনুনয় করল।

কিছু কিছু আত্মীয়স্বজন এর মধ্যে এসে পড়েছেন। তাঁদের থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তরুণ সংঘের ছেলেরা দুবেলা কাজ করছে এখানে। তারা তো বটেই ডুডুয়ার কিছু লোক দু-বেলা পাত পাড়ছে এ বাড়িতে।

সমস্যা হল সন্ধেবেলায়। নাগেশ্বর গোরক্ষ ভেবে পাচ্ছিল না কী করে তার সমাধান করবে। বাড়িতে গিজগিজ করছে লোক, পরে আরও বাড়বে। এইসময়ে বাইরের ঘরে বসে পানাহার করা অসম্ভব ব্যাপার। গত পরশু যা হওয়ার শেষ বার হয়ে গিয়েছে। এরকম চললে সেই বউভাতের পর বাড়ি খালি না হওয়া পর্যন্ত আহ্নিকবিহীন হয়ে থাকতে হবে। ভাবলেই শরীর ঝিমঝিমিয়ে উঠছিল ওদের? তার পর যদি বউমা এসে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন তাহলে তো কথাই নেই।

বিকেল নাগাদ ওদের দুজনকে দেখে সতীশ রায় বললেন, 'এইমাত্র একটা খারাপ খবর পেলাম হে।'

ওরা মুখ চাওয়াচায়ি করল। যে কোনও খবর তাদের ডিঙিয়ে কেউ বড়বাবুর কানে পৌঁছে দিচ্ছে। এ তো ভালো কথা নয়।

'পোস্টমাস্টার মেয়ে নিয়ে ফিরে এসেছে।' বিষণ্ণ গলায় বললেন সতীশ রায়।

'মেয়ে নিয়ে? মেয়ের তো বিয়ে হয়ে গিয়েছিল!' গোরক্ষ বলল।

'হ্যাঁ হয়েছিল। কিন্তু বাসরঘর থেকে জামাই জ্বরে পড়ে। নতুন বউ নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে।'

'সর্বনাশ। কলকাতায় শুনেছি খুব ডেঙ্গু হচ্ছে এখন।' নাগেশ্বর বলল।

'তেরাত্তির না কাটতে ওই ডেঙ্গুতেই মারা গিয়েছে ছেলেটা। বউভাত হয়নি। বিধবা মেয়েকে নিয়ে ফিরে এসেছে পোস্টমাস্টার। চল, একবার দেখা

করে আসি।'

দূরত্ব এমন কিছু নয় তবু সতীশ রায় গাড়িতে উঠলেন। সামনে গোরক্ষ এবং নাগেশ্বর।

পোস্টমাস্টার কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সতীশ রায় ওঁর কাঁধে হাত রাখলেন, কোনও কথা বললেন না। নাগেশ্বর বলল, 'ভগবানের যে কী ইচ্ছে কখন হয়, কেন হয় তা তিনিই জানেন।'

গোরক্ষ বলল, 'কিন্তু মেয়েটা তো কোনও দোষ করেনি, ও কেন শাস্তি পেল?'

সতীশ রায় মাথা নাড়লেন, 'শাস্তির কথা কেন বলছ? ও তো কোনও অন্যায় করেনি। আপনি ভেঙে পড়বেন না মাস্টারমশাই। নিজেকে শান্ত করুন।'

'পারছি না। সাধ্যের বাইরে গিয়ে খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিলাম। বেচারা একটা দিনও স্বামীর ঘর করতে পারল না। উলটে অপয়া বদনাম নিয়ে ফিরে এল। এখন সারাজীবন পড়ে আছে সামনে, ওর যে কী হবে!'

'আবার বিয়ে দেবেন। আমি আপনার পাশে আছি। কয়েকটা মন্ত্র পড়লেই কেউ বিবাহিতা হয় না। ওর তো ফুলশয্যাই হয়নি।' সতীশ রায় বললেন, 'বাড়ির সবাইকে আমার কথা বলবেন। আমি মনে করি সে এখনও কুমারী।'

কিছুক্ষণ সান্ত্বনা দিয়ে আবার গাড়িতে উঠে বসলেন সতীশ রায়। এখন ধূপছায়া নেমেছে পৃথিবীতে। নাগেশ্বর আর গোরক্ষ ড্রাইভারের পাশে বসে পোস্টমাস্টারের মেয়ের দুর্ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করছিল।

সতীশ রায় বললেন, 'ডুডুয়া ব্রিজ ছাড়িয়ে হাইওয়ে ধরে চল।'

ড্রাইভার মাথা নাড়ল।

নাগেশ্বর জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছি বড়বাবু?'

'ভ্রমণে।' সতীশ রায় উত্তর দিলেন।

দু-পাশে পাতলা অন্ধকার। নির্দেশ পেয়ে গাড়ি হাইওয়ে থেকে নেমে জঙ্গলের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। সতীশ রায় বললেন, 'ডিকি থেকে বাস্কেট বের করে আনো। আলো জ্বালার দরকার নেই।'

ড্রাইভার আদেশ মান্য করতে দেখা গেল বাস্কেটের ভেতরে দুধরঙের পানীয়, গ্লাস, জল, কাজু এবং চিনেবাদাম সাজানো রয়েছে। গাড়ির দরজা খোলা থাকায় হালকা আলোয় এসব স্পষ্ট দেখতে পেয়ে নাগেশ্বর চেঁচিয়ে উঠল, 'একটু

পায়ের ধুলো দিন বড়বাবু। ওঃ। হৃদয় একেবারে শীতল করে দিলেন। এ আপনি ছাড়া কেউ পারত না।'

গোরক্ষ বলল, 'একেবারে চমকে দিয়েছেন বড়বাবু। খুব ভালো হল। এখন বাড়ি তো বাজার। তার চেয়ে এই নির্জনে, দ্যাখো নাগেশ্বর, জোনাকি জ্বলছে।'

'উল্লাস।' বলে চুমুক দিলেন গ্লাসে সতীশ রায়, 'একটা কথা। তোমরা হাইওয়ে থেকে ডুডুয়ায় ঢুকেই গাড়ি থেকে নেমে যাবে। আজ রাত্রে আমার বাড়ির লোকজন দু-দুটো মাতাল দেখুক তা আমি চাই না।'

'আপনি যা চান তাই হবে।' নাগেশ্বর মাথা নেড়ে গোরক্ষর দিকে তাকাল, 'আহ্নিক যদি করতে চাও তাহলে রাত্রে বড়বাবুর বাড়িতে যাওয়া চলবে না।'

গোরক্ষ বলল, 'মাথা খারাপ। নিজের সর্বনাশ করব কেন?'

নাগেশ্বর বলল, 'তা যাই বল, বিয়ের মতো বিয়ে হচ্ছে এই ডুডুয়ায়। গর্বে বুক ভরে যাচ্ছে।'

'বরযাত্রীরা ক'টা বাস চেপে যাবে?' প্রথম গ্লাস শেষ করে ফেলল গোরক্ষ। আজ পরিবেশ পালটে যাওয়ায় তার গতি বেড়েছে।

'ক'টা বাস মানে? বরকে নিয়ে বারোজন যাবে, তার জন্যে বাসের দরকার হবে কেন? একটা অ্যাম্বাসাডার আর একটা সুমোতেই চমৎকার ধরে যাবে।'

'সেকি? মাত্র বারোজন বরযাত্রী?' হাঁ হয়ে গেল নাগেশ্বর?

'আমরা কি খেতে পাই না যে পঞ্চাশ ষাটজন লোক নিয়ে মেয়ের বাড়িতে খেতে যাব? এগারোজনের টিম একজন দ্বাদশ ব্যক্তি। লোক দেখে বলবে এরা অত্যাচার করতে আসেনি। কে কে যাবে সেটা এখনও ঠিক করিনি।' সতীশ রায় বললেন।

হঠাৎ পেছনের জঙ্গলে শব্দ হল। চমকে উঠল গোরক্ষ। গাড়ির দরজা বন্ধ করতেই আলো নিভে গেল। নাগেশ্বর বলল, 'শব্দ কিসের?'

সতীশ রায় চিৎকার করলেন, 'ড্রাইভার।'

গাড়ি পার্ক করে ড্রাইভার নেমে গিয়েছিল কিন্তু তার তো কাছেপিঠে থাকার কথা। এদিকে আওয়াজটা বেড়েই চলেছে।

'বড়বাবু, মনে হয় কোনও বন্যজন্তু—! কী হবে?' গোরক্ষ বলল।

'কেউ গাড়ি চালাতে জানো?' সতীশ রায় পেছন থেকে বললেন।

'না, না।' দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল।

'ওয়ার্থলেস। যাও, ড্রাইভারকে খুঁজে বের করে নিয়ে এসো।' কড়া গলায়

বললেন সতীশ রায়। অন্ধকারেই গ্লাস শেষ করল নাগেশ্বর।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি দুলে উঠল নৌকোর মতো। সতীশ রায় দেখলেন অন্ধকারে নড়ছে। চাপা গলায় বললেন, 'চুপ! হাতি।'

'হা-হা।' নাগেশ্বরের দাঁত বাজনা বাজাতে লাগল।

একটু একটু করে এগিয়ে এল যে প্রাণীটি গাড়ির পাশে তার আয়তন আদৌ বেশি নয়। চোখ সয়ে যাওয়া অন্ধকারে সতীশ রায় দেখলেন একটা হাতির বাচ্চা শুঁড় তুলে কিছু শুঁকে গাড়ির জানলায় ধাক্কা মারছে। যত ছোট হোক ইচ্ছে করলে ঠেলে উলটে দিতে পারে বাচ্চাটা। আর ও নিশ্চয়ই একা নেই, দলে মা-বাবাও আছে। তারা একটা পা তুলে দিলে দেখতে হবে না।

সতীশ রায় বললেন নিচু স্বরে, 'দরজা খুলে সোজা দৌড়াও। এখানে বসে থাকলে মারা পড়বে।'

'—দ-দ-দ।' নাগেশ্বর তোতলাল।

'যে পড়ে থাকবে সে মরবে। এই আমি দরজা খুলছি।'

পরের কিছুটা সময় চিরটাকাল ভুলে থাকবেন সতীশ রায়। হাইওয়ের ওপর উঠে তাঁর বুক থেকে হৃৎপিণ্ড যেন ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। অনেকদিন দৌড়াননি, তার ওপর এভাবে দৌড়। বয়সটাও জানান দিচ্ছে। অনেকক্ষণ হাঁপানোর পর শুনতে পেলেন, মিনমিনে গলায়, 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ।'

ওরা যে মানিকজোড় তাতে কোন সন্দেহ হল না। সতীশ রায় বললেন, 'চল, হেঁটেই ফিরতে হবে।'

পিচের রাস্তায় বসে পড়ল ওরা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতেই পাশের গাছ থেকে ড্রাইভারের গলা শোনা গেল, 'বড়বাবু!'

অন্ধকারেও যেটুকু দেখা যায়, ড্রাইভারকে নেমে আসতে দেখা গেল, 'আটটা হাতি, ভয়ে সাড়া দিতে পারিনি।'

'তা-তাই বলে আমাদের বিপদে ফেলে রেখে তুমি গাছে উঠে বসে থাকবে। বড়বাবু, এর চাকরি খতম করে দিন।' নাগেশ্বর বলল।

'তুমি হলে কী করতে? বিপদভঞ্জন হয়ে উদ্ধার করতে যেতে?' সতীশ রায় খেঁকিয়ে উঠলেন,' গাড়িটাকে বোধহয় মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে ওরা।'

'এখন কোনও আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না।' গোরক্ষ বলল।

'ঠিক কথা। ওরা বোধহয় ওখান থেকে চলে গেছে।' নাগেশ্বর বলল।

সতীশ রায়ও কান পেতে কোনও শব্দ শুনতে পেলেন না। হাতিরা কখনও

এক জায়গায় বেশিক্ষণ শান্ত হয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে না। এই অঞ্চলের জঙ্গলে হাতির দল ধান পাকলে আসে। সেসময় তাদের তাড়াবার জন্যে প্রস্তুত থাকে কৃষকেরা। এমন অসময়ে ওরা কেন এল? ওদিকের জঙ্গলে কী খাবার একদম নেই! সতীশ রায় বললেন; 'সাবধানে এগিয়ে গিয়ে দ্যাখো তো গাড়ির কি অবস্থা। মনে হচ্ছে হাতিরা ওখানে নেই। যদি দ্যাখো আছে, তাহলে কাছে যাওয়ার দরকার নেই।'

ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত এগোল ড্রাইভার। নাগেশ্বর বলল, 'ওকে দেখে আবার রেগে না যায় হাতিরা!'

একটু একটু করে পাঁচ মিনিট কেটে যাওয়ার পর ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে এল। তারপর হেডলাইট জ্বালিয়ে দ্রুত চলে এল গাড়িটা হাইওয়ের ওপর। ঝটপট গাড়িতে উঠে বসে সতীশ রায় বললেন, 'আশ্চর্য! গাড়ির ক্ষতি করেনি ওরা?'

'না।' ড্রাইভার আবার গাড়ি চালু করল।

ডুডুয়া ব্রিজের ওপর যখন চলে এল ওরা, তখন নাগেশ্বর চিৎকার করে উঠল, 'আরে! বোতলটা কোথায় গেল? দাঁড়াও, গাড়ি থামাও।'

দরজা খুলতেই আলো জ্বলল। সিটের ওপর বা নিচে কোথাও ওদের বোতল নেই। গোরক্ষ চেঁচিয়ে উঠল, 'জানলার কাচ নেই। ভেঙে ফেলেছে।'

সতীশ রায় সেটা দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর পাশে রাখা বাস্কেটটার দিকে তাকাতে দেখলেন সেটা উলটে পড়ে গেছে নিচে। দুটো সিটের মাঝখানে টাইট হয়ে আটকে আছে সেটা।

'শালা। বদমাস হাতি। আমাদের বোতল ডাকাতি করে নিয়ে গেছে।' চেঁচিয়ে উঠল নাগেশ্বর।

গোরক্ষ বলল, 'বোতলের গন্ধেই এসেছিল। হাতিরা মদ খেতে খুব ভালোবাসে বড়বাবু, আপনারটাও নিয়ে গেছে?'

সতীশ রায় বাস্কেটটা কোনমতে তুলতে দেখতে পেলেন তাঁর বোতল নিচে পড়ে আছে। বললেন, 'চেষ্টা করেছিল, বাস্কেটের জন্যে নিতে পারেনি।'

'শত্রু শত্রু, সর্বত্র শত্রু।' বিড়বিড় করল নাগেশ্বর, 'কী কাণ্ড! ব্যাটা গ্লাসদুটোও নিয়ে গেছে। ওইটুকুনি পুঁচকে হাতি, বড় হলে কী হবে!'

বাড়ির কাছে এসে গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন সতীশ রায়। তারপর নিজের বোতলটা ড্রাইভারের হাতে দিয়ে বললেন, 'কোনও নির্জন জায়গায় গিয়ে

ওদের দু-দু'বার গ্লাসে ঢেলে দেবে। তার বেশি নয়। তারপর বোতলটা বাস্কেটে রেখে দেবে। আমি যাচ্ছি!'

'আপনার জিনিস আমাদের দিলেন?' নাগেশ্বর গদ্‌গদ।

'বাড়িতে উৎসব, খাও একদিন।' দরজা খুলে নেমে পড়লেন তিনি।

'কিন্তু গ্লাস? গ্লাস যে নেই?'

'জোগাড় করে নাও। ঠিক পেয়ে যাবে।' হাঁটলেন সতীশ রায়।

দুহাতে মাথা ঠুকল নাগেশ্বর, 'নমস্য মানুষ।'

'দয়ার শরীর।' গোরক্ষ বলল।

'চল ভাই ড্রাইভার।' নাগেশ্বর বলল।

'আমি ভাবছি, বউমা বাড়িতে এলে কী হবে আমাদের!' গোরক্ষ বলল।

'কালকের কথা কাল ভাবব। এখন চল, একটা নির্জন জায়গা বের করতে হবে যেখানে হাতি আসবে না।' নাগেশ্বর সুর ধরল।

খারাপ খবর বাতাসের আগে ছোটে। তাকে মদত দেয় কিছু ঈর্ষাকাতর মানুষ। স্থানীয় মানুষেরা ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয় এখানেই, যে যার মতো করে। পোস্টমাস্টার মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়েছিলেন কলকাতায়, সেটা অনেকেই ভালো চোখে দ্যাখেনি। অনেকে ভেবেছিলেন এটা ডাঁট দেখানোর জন্যে, বেশিরভাগই হতাশ হয়েছিলেন বিয়ের খাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ায়। তাই পোস্টমাস্টারের মেয়ে বিয়ের পরেই বিধবা হয়েছে জানার পর সেটা পাঁচজনকে জানাবার তাগিদ অনুভব করেছিলেন অনেকেই। বাইরে দুঃখ দুঃখ ভাব থাকলেও একটা চোরা সুখও বুদ্‌বুদের মতো ছিল।

হরিপদ এসে খবরটা এলোকেশীকে দিল। আত্মীয়স্বজনের জন্যে চাররেলা খাবার তৈরি থেকে মুক্তি পেয়েছে এলোকেশী ঠাকুর এসে যাওয়ায়। খবরটা শুনে চোখ বড় করে বলল, 'খবরদার কথাটা ছোটবাবুকে বোলো না হরিপদদা।'

'কেন?'

'এসময় খারাপ খবর শুনতে নেই।'

কিন্তু বন্যার জল বাঁধ ভাঙলে আটকানো অসম্ভব। সত্যচরণের ঘরে ডাক পড়ল এলোকেশীর। এলোকেশী ঘরে ঢুকে দেখল খাটের মাঝখানে ফ্যাকাসে মুখে বসে আছে সত্যচরণ।

'কী হল?'

'এলোদি—।' গলা ধরে গেল সত্যচরণের।

—বলো।'

'যা শুনেছি তা ঠিক?'

'আ মরণ। তোমার কানে কে দিল?'

'মতির মা। বলল আমি নাকি গুরুবলে বেঁচে গিয়েছি। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে নির্ঘাত মরে যেতাম। ওর কপালে বৈধব্য যোগ ছিল তো!'

'যত্ত বাজে কথা।' রেগে গেল এলোকেশী, 'আমি তো প্রায় আধমরা লোককে বিয়ে করে বিধবা হয়েছি। সুস্থ লোককে বিয়ে করলে কী হতাম? কী জন্যে ডাকছিলে?'

'তুমি একটু ওদের বাড়িতে যাবে?'

'ওমা! আমি গিয়ে কী করব?'

'ওকে বলবে খবরটা শুনে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি। ওকে নিয়ে আমি প্রায় পঞ্চাশটা কবিতা লিখেছি, সেগুলো দিয়ে দেবে ওকে!'

'আশ্চর্য! কাঁচা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ো না তো?'

'কেন?' অবাক হল সত্যচরণ।

'সে মরছে নিজের জ্বালায়! বিধবা হয়ে বাপের ঘাড়ে পড়ে থাকলে কি হয় তা আমাকে দেখে বুঝতে পারছ না?' এলোকেশী ঠোঁট কামড়াল।

'কিন্তু—! আমি যে ওর কথা ছাড়া কিছু ভাবতে পারছি না।'

'তাই? ঠিক আছে। আমি বড়বাবুকে গিয়ে বলছি।'

'কী বলবে?'

'বলব, মালবাজারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে ডুডুয়ার পোস্টমাস্টারের মেয়ের সঙ্গে ছোটখোকার বিয়ে দিন। এটা তার ইচ্ছে।'

'সর্বনাশ। মেরে হাড় ভেঙে দেবে বাবা। জানো, মাঝে মাঝে বাবাকে আমার কংস, রাবণ বলে মনে হয়।' সত্যচরণ শ্বাস ফেলল।

'তাহলে এক কাজ করো, পাখিকে নিয়ে কোথাও উড়ে যাও।' ঠোঁট টিপে হাসল এলোকেশী।

'হুঁঃ। তুমি কী মনে করেছ একথা আমি ভাবিনি? ভেবেছি। কিন্তু ও যদি আমার সঙ্গে যেতে না চায়। মানে, আমার মনে যে এত ব্যাপার আছে তা তো ও জানে না। তাছাড়া যদি বা যায় তাহলে ওকে নিয়ে কোথায় যাব? কোথায় থাকব? কী খেতে দেব? ব্যাস, আর সাহস পাই না।' সত্যচরণ আবার শ্বাস

ফেলল।

'সাহস যখন নেই তখন বাপ যা বলছে তাই করো।' এলোকেশী আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বিকেল তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না সত্যচরণ। বাড়ির পেছন দরজা দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল সে। তারপর ঘুরপথে হেঁটে পোস্টঅফিসের সামনে চলে এল।

দুপুরের পর পোস্টঅফিস ফাঁকাই থাকে। ছোট্ট কাউন্টার। তার ভেতরে বসে একটা লোক খবরের কাগজ হাতে নিয়ে পেছন ফিরে কথা বলছে, 'আপনি ছাড়বেন না মাস্টারমশাই। বিয়ে যখন একবার হয়ে গিয়েছিল তখন স্বামীর সব সম্পত্তি আপনার মেয়ে পাবেই।

'আঃ। চুপ করো। এখনই এসব কথা কেন?' ভেতরে বসা একজন কিছু লিখতে লিখতে বললেন।

'লোহা গরম থাকতে থাকতে ঘা দিতে হয়। প্রিয়জন মারা গেলে লোকে শোকে অন্ধ হয়ে পড়ে থাকে না তাকে দাহ করতে যায়? এও তেমনি। এখনই একটা ভালো উকিল দেখে—কি চাই?' লোকটা হঠাৎই সত্যচরণের উপস্থিতি টের পেয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'না, মানে। বাবা এসেছিলেন?' আচমকা জিজ্ঞাসা করে ফেলল সত্যচরণ।

'বাবা? কে তোমার বাবা?' লোকটি সন্দিগ্ধ।

'শ্রীযুক্ত সতীশ রায়।'

'অ্যাঁ! তু-তুমি বড়বাবুর ছেলে। বেশিদিন এখানে কাজ করছি না তো তাই তোমাকে দেখিনি। কিছু মনে কোরো না। না তো, উনি আজ আসেননি। মানে, এখানে ওঁর পায়ের ধুলো খুব কম পড়ে।' লোকটি বলল।

'ও।'

'দাঁড়াও। মাস্টারমশাই, দেখুন কে এসেছে? বড়বাবুর ছেলে।' লোকটি হাসল।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলেন পোস্টমাস্টার, 'ও, তাই নাকি? তোমার শুনলাম বিয়ে?

মুখ নিচু করল সত্যচরণ।

লোকটি বলল, 'আমি এখনও নেমন্তন্ন পাইনি? আপনি পেয়েছেন মাস্টারমশাই?'

'আহ্। চুপ করো। তা বাবা তোমার বাবা তো এখানে আসেননি।'

'ও।'

'উনি কাল সন্ধেবেলায় এসে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন।'

'ও। আপনার মেয়েকে বলবেন আমরা ডুডুয়ার সবাই ওর ভালো চাই।' গড়গড় করে বলে গেল সত্যচরণ।

'শুনে খুব খুশি হলাম।'

লোকটি বলল, 'পাখি যদি ওর মুখ থেকে শোনে তাহলে মনে জোর পাবে।'

'সে তো বিছানা থেকে উঠতেই চাইছে না।' পোস্টমাস্টার বললেন।

'বড়বাবুর ছেলে এসেছে শুনলে হয়তো স্বাভাবিক হবে। ওকে নিয়ে গিয়ে একবার দেখুন না।' লোকটি উপদেশ দিল।

পোস্টমাস্টারের বাড়ি অফিসের পেছনেই। লাগোয়া। সত্যচরণকে নিয়ে পোস্টামাস্টার বাড়ির ভেতরে এলেন। একটা উঠোনকে ঘিরে গোটা চারেক ঘর। তাদের দেখে পোস্টামাস্টারের স্ত্রী এগিয়ে এলেন।

পোস্টামাস্টার বললেন, 'ডুডুয়ার বড়বাবুর ছেলে। গতকাল ওর বাবা নিজে এসেছিলেন, আজ ও এসেছে।'

ভদ্রমহিলা আঁচলের প্রান্ত দাঁতে কাটলেন।

'তোমরা কথা বলো। আমি কাজ শেষ করি।' পোস্টমাস্টার চলে গেলেন।

বারান্দায় চেয়ার দেখিয়ে ভদ্রমাহিলা বললেন, 'বসুন।'

'আমাকে আপনি বলবেন না। আমি অনেক ছোট।'

শব্দ করে শ্বাস ফেললেন ভদ্রমহিলা, 'কপাল পুড়িয়ে এল মেয়েটা। এত নরম এত শান্ত মেয়ের কপাল যে এভাবে পুড়বে স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'আমরা—আমরা সবাই খুব কষ্ট পাচ্ছি।' বিড় বিড় করে বলল সত্যচরণ।

'এখন ওর কী হবে ভেবে পাচ্ছি না।' ভদ্রমহিলা দরজার দিকে তাকালেন।

'সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা তো আছি। ও কোথায়?' সাহসী হল সত্যচরণ।

'বিছানায় পড়ে আছে। আচ্ছা, দেখছি।' ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে যেতেই সত্যচরণ দু-হাতে মাথার চুল ঠিক করে নিল। তখন ভেতর থেকে অনুরোধ এবং প্রত্যাখ্যানের সংলাপ ভেসে আসছে। শেষপর্যন্ত মায়ের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল পাখি। সত্যচরণের মনে হল সে শোকের প্রতিমা দেখছে।

'বড়বাবুর ছেলে, নিজে তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।' ভদ্রমহিলা বললেন।

'আপনি বসুন।'

'তুমি চা খাবে বাবা?'

'না না।'

'একটু শরবত করে দিই।' ভদ্রমহিলা রান্নাঘরে চলে গেলেন।

সত্যচরণ কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। পাখি দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। যেন সময় স্থির হয়ে আছে বলে মনে হল সত্যচরণের।

'কিছু বলবেন?' পাখি কথা বলল।

'না, মানে, আমাকে কি কখনও দেখেছেন?'

'না।'

'কখনও না?'

মাথা নেড়ে নীরবে না বলল পাখি।

মুখ নিচু করল সত্যচরণ। তারপর উদাস হয়ে উঠোনের একপাশের আমগাছের দিকে তাকাল সে। একটা ল্যাজঝোলা পাখি হুড়মুড়িয়ে উড়ে গেল গাছের ডাল ছেড়ে।

সত্যচরণ বলল, 'তাহলে যাই।'

'শরবত খাবেন না?'

'কী হবে খেয়ে! আচ্ছা, আপনি আমাকে আগে নাই বা দেখে থাকলেন, এখন তো দেখলেন! এর পরে তো না বলতে পারবেন না?'

কপালে ভাঁজ পড়ল পাখির, 'তা তো পারবই না!'

'ব্যাস। তাহলেই হল।' হাসল সত্যচরণ, 'আমি যাই। আপনার মাকে বলে দেবেন।'

দ্রুত সে বেরিয়ে গেল পাশের টিনের দরজা দিয়ে। পাখির মুখে না শুনে যে বিশাল পাথরটা বুকের ওপর চেপে বসেছিল শেষ কথায় তা সরে গেছে একেবারেই।

বেশ সকালবেলায় নির্মলবাবু এলেন সদর থেকে। এসে হকচকিয়ে গেলেন।

সতীশ রায় তাঁকে দেখে একটু বিব্রত। ছেলের বিয়েতে তিনি অবনীদাকে

নেমন্তন্ন করেছেন কিন্তু ওঁর ভাই নির্মলের কথা খেয়াল করেননি।

নির্মলবাবু বললেন, 'বুঝতেই পারছি আপনি খুব ব্যস্ত। আপনার ব্যস্ততা কেটে গেলে না হয় চা-বাগানের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে।'

মাথা নাড়লেন সতীশবাবু, 'ছেলের বিয়ে, ব্যস্ততার কী আছে। আপনি বসুন। অবনীদা বোধহয় কিছু বলেননি বাড়িতে?

'না। দাদাকে তো জানেনই। আত্মভোলা মানুষ। যখনই এখান থেকে ফিরে যান অল্পবয়সী ছেলেদের প্রশংসা করেন। উনি প্ল্যান করেছেন চার বছর ধরে ওদের তৈরি করবেন এবং তারপর ওই টিম নিয়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেলবেন। ওঁর বিশ্বাস পশ্চিমবাংলার সেরা দলগুলোকে জব্দ করতে পারবে এই ছেলেরা।' নির্মলবাবু বললেন, 'দাদা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন।'

'সাফল্য পেতে গেলে স্বপ্ন দেখতেই হয়। যাক গে, আপনার কী ধারণা হল? আমাদের এই এলাকায় চা গাছের চাষ করা যাবে?'

নির্মলবাবু একটু থমকে গিয়ে হেসে ফেললেন, 'এতদিন আমি চা-বাগান তৈরির কথা শুনেছি, চা-গাছ চাষ করার কথা এই প্রথম শুনলাম। কথাটা ঠিকই। হ্যাঁ। যাবে। তবে সয়েল টেস্ট করাতে হবে।'

'বাজেট কিছু করেছেন?'

'আনুমানিক এক কোটি টাকার কাছাকাছি।' নির্মলবাবু বললেন, 'জমি কিনে নিয়ে প্রজেক্ট রিপোর্ট দিলে ব্যাঙ্ক বা সরকার লোন দেবে।'

'সেটা আমি জানি। আপনি এগিয়ে যান। আমাকে আরও তিন সপ্তাহ সময় দিন। বাড়ির ঝামেলা চুকে গেলে আপনার সঙ্গে বসব। কিন্তু—।' সতীশ রায় নির্মলবাবুর হাত ধরলেন, 'ত্রুটি মার্জনা করতে হবে।'

'সেকি? এসব কী বলছেন?' হাত ছাড়িয়ে নিলেন নির্মলবাবু।

'আমার পুত্রবধূর হাতে ভাত খেতে আপনাকে আসতে হবে। এবং সপরিবারে।' দ্রুত পকেট থেকে নিমন্ত্রণ পত্র বের করে নাম লিখে সতীশ রায় নির্মলবাবুর হাতে দিলেন।

'আপনার নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলাম। কিন্তু একটা অনুরোধ। বউভাতের দিন আমাকে আসতে বলবেন না। আমি না হয় সামনের রবিবারের দুপুরে এসে ভাত খেয়ে যাব। আচ্ছা চলি।' নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন নির্মলবাবু।

কিছুক্ষণ ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন সতীশ রায়। তারপর হাসলেন। ভাই তো দাদার কিছু কিছু পাবেই। এই লোক চাটুকার নয়। এর হাতে এক কোটি

টাকার প্রকল্পের দায়িত্ব স্বচ্ছন্দে দেওয়া যায়। যার আত্মসম্মানবোধ প্রবল সে কখনই নিজেকে ছোট করতে পারবে না।

ঘড়ির দিকে তাকালেন সতীশ রায়। নটা বেজে গেছে। চিৎকার করে ডাকলেন, 'হরিপদ, হরিপদ।' নাগেশ্বর ছুটে এল ভেতর থেকে, 'কিছু বলছেন?' সেই ভোর থেকেই ওরা চলে এসেছে এই বাড়িতে।

'আঃ। তুমি কেন? গায়ে হলুদের তত্ত্ব নিয়ে তুমি যাবে নাকি? সকাল নটা বেজে গেল তবু কারও হুঁশ নেই। হরিপদ।' চিৎকার করলেন তিনি।

হরিপদ ছুটে এল।

সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'গায়ে হলুদের তত্ত্ব রেডি?'

'না-মানে—।' মাথায় হাত দিল হরিপদ।

'আশ্চর্য! ওই মেয়েটা হাঁ করে বসে আছে। এখান থেকে তত্ত্ব না গেলে সে স্নান করতে পারবে না আর তোমরা ইয়ার্কি মারছ?' ক্ষেপে গেলেন সতীশ রায়।

'আসলে এখনও, এয়োরা এসে পড়েননি—।' হরিপদ বলল।

'এয়ো? ও। তাঁদের খবর দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। মতির মা বলে এসেছিল।'

'সংসারের কাজ সামলে তাঁরা আসবেন। কিন্তু এলোকেশী কী করছে?'

'বসে আছে। মতির মা বলেছিল এই গায়ে হলুদের ব্যাপারটা এয়োরাই করুক।' হরিপদ নিচু গলায় জানাল।

'কেন? এলোকেশী কী করছে? অ। এখনও সেই বিধবার অজুহাত চালাচ্ছে? উঃ। কী যন্ত্রণা! যাও, গিয়ে বলো, দশ মিনিটের মধ্যে এলোকেশী যেন যা করার তা শেষ করে। আর সে যদি না করতে চায় তাহলে এই বাড়িতে থাকার দরকার নেই। যাও।' সতীশ রায়ের কথা শেষ হওয়ামাত্র হরিপদ অদৃশ্য হল।

চুপচাপ শুনছিল নাগেশ্বর, হঠাৎ হুংকার দিল, 'এতক্ষণে তোমার আসার সময় হল? গায়ে হলুদ দেওয়ার জন্যে আগে আসতে বলেছিলাম না?'

সতীশ রায়কে দেখে গেট পেরিয়ে আসা স্থূলাঙ্গিনী ঘোমটা টানলেন মাথায়, 'দিদির দেরি হয়ে গেল আসতে।'

গোরক্ষ বেরিয়ে এল, 'দেরি তো হবেই। গায়ে হলুদে আসতেই এত সাজ, বউভাতের দিন যে কত দেরি হবে কে জানে।'

সতীশ রায় দেখলেন স্থূলাঙ্গিনী ঘোমটা টেনে ভেতরে যাচ্ছেন এবং তখনই

তাঁর পেছনে ক্ষীণাঙ্গিনীকে দেখা গেল। প্রথম জন নাগেশ্বরের, দ্বিতীয় জন গোরক্ষার স্ত্রী। ঠিক তখনই শাঁখ বেজে উঠল। সঙ্গে উলুধ্বনি। মহিলারা ভেতরে যাওয়ার আগেই হরিপদ ছুটে এসে জানাল, 'গায়ে হলুদ হয়ে গিয়েছে।'

'বাঃ। গাড়িতে তোল তত্ত্বগুলো।'

নাগেশ্বর গোরক্ষ তত্ত্ব নিয়ে গাড়িতে যেতে চেয়েছিল মেয়ের বাড়িতে। কিন্তু 'তোমাদের এখানে অনেক কাজ আছে' বলে তাদের আটকালেন সতীশ রায়। হরিপদ সেজেগুজে গাড়িতে উঠল। তরুণ সংঘের ছেলেরা বাইরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দুজনকে সঙ্গে যেতে বললে তারা আনন্দিত হয়ে গাড়িতে উঠল।

দুটো গাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। সতীশ রায়ের গাড়িতে বর যাবে। ওর সঙ্গে থাকবে মঙ্গল এবং আরও দুজন। বাকি দুটো গাড়িতে বরকর্তা এবং বরযাত্রী। বিয়ের লগ্ন সন্ধে সাড়ে সাতটায়। বিকেল পাঁচটায় বেরুতে হবে। পৌঁছে আশীর্বাদ-পর্ব আছে দু-পক্ষের। নাগেশ্বররা চেয়েছিল আগেই আশীর্বাদ হয়ে যাক। আশীর্বাদ উপলক্ষে খাওয়াদাওয়াটা বেশ জম্পেশ করে হত। কিন্তু সতীশ রায় বলেছিলেন, 'তাহলে তো ওদেরও আগে করতে হবে। মিছিমিছি ভদ্রলোকের খরচ বাড়িয়ে কী লাভ।'

চারটে নাগাদ বরযাত্রীরা তৈরি হয়ে এল। নাগেশ্বর এবং গোরক্ষর সাজ দেখবার মতো। ধুতি পাঞ্জাবিতেই হয়নি। কাঁধে উড়নি নিয়েছে। নিজে তৈরি হয়ে নিয়ে সতীশ রায় হাঁকলেন, 'হরিপদ, খোকাকে তৈরি হয়ে নিতে বলো।' কথার পরেই খেয়াল হল তাঁর, 'বাঙালির ছেলে বিয়ে করতে যাবে ধুতি পরে, সেটা পরতে পারবে কিনা জিজ্ঞাসা করো। নইলে নাগেশ্বর পরিয়ে দেবে ধুতি।'

হরিপদ ভেতরে গেল। এখন গ্রামের অনেক বাড়ির মহিলা ভিড় করেছেন অন্দরমহলে। সত্যচরণের ঘরে উঁকি মারল হরিপদ। সে ঘরে নেই। বাইরে এসে হরিপদ এলোকেশীকে জিজ্ঞাসা করল, 'খোকা কোথায়?'

'ঘরে নেই?'

'না।'

'ঘণ্টাখানেক আগে বাথরুমে যেতে দেখেছিলাম।'

হরিপদ সেখানে গিয়ে দেখল বাথরুমের দরজা খোলা, সেখানে কেউ নেই। কথাটা মতির মায়ের কানে যেতেই সে ব্যস্ত হয়ে খোঁজ নিতে লাগল। না

বাড়িতে না বাগানে, কোথাও সত্যচরণকে পাওয়া গেল না।

মতির মা দুহাতে মাথা ধরে বসে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল, 'বলেছিলাম, বলেছিলাম। এখন কী হবে?'

হরিপদ জিজ্ঞাসা করল, 'কী বলেছিলে?'

'এখনই বিয়ে না দিতে।' কাঁদতে কাঁদতে বলল মতির মা।

'চোপ্। বড়বাবু শুনলে আস্ত রাখবে না। আমি যাই খুঁজে দেখি।' হরিপদ বেরিয়ে গেল খিড়কি-দরজা দিয়ে।

ক্রমশ খবরটা অন্দরমহলে ছড়িয়ে গেল। সত্যচরণকে পাওয়া যাচ্ছে না। এলোকেশীর সন্দেহ হল। পোস্টমাস্টারের বাড়িতে যায়নি তো? সে খিড়কি দরজা দিয়ে দৌড়াল।

পোস্টমাস্টারের বাড়িতে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে এলোকেশী জিজ্ঞাসা করল, 'খোকা কি এখানে এসেছে?'

বারান্দায় দাঁড়ানো পোস্টামাস্টারের বউ অবাক। 'কে খোকা?'

'বড়বাবু, মানে সতীশ রায়ের ছেলে।' এলোকেশী বলল।

পাখি বেরিয়ে এসে মায়ের পাশে দাঁড়াল। পোস্টমাস্টারের বউ বলল, 'কদিন আগে এসেছিল। কেন?'

'ওকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সেকি?

'আজ ওর বিয়ে!'

'ও মাগো,' ছেলেটার বোধহয় মাথা ঠিক নেই।' পোস্টামাস্টারের বউ বলল।

'মানে?'

'ও এসে পাখিকে বারংবার জিজ্ঞাসা করেছে ওকে কখনও দেখেছে কিনা। দেখলে ওর কী লাভ হবে কে জানে!'

এলোকেশী আর দাঁড়াল না। বাড়ি ফিরে এল খিড়কি দরজা দিয়ে। এসে দেখল হরিপদ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ঘিরে মহিলাদের ভিড়। এইসময় নাগেশ্বর ভেতরে এল, 'খোকা রেডি? বড়বাবু তাড়া দিচ্ছেন। এখনই বেরুতে হবে আমাদের।'

নাগেশ্বরের বউ মিনমিন করে বলল, 'তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'অ্যাঁঃ! সেকি? ও হরিপদ?' চিৎকার করল নাগেশ্বর।

হরিপদ চুপচাপ মাথা নাড়ল।

নাগেশ্বর তৎক্ষণাৎ দৌড়াল। বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সতীশ রায় ঘটকের সঙ্গে হেসে কথা বলছিলেন। নাগেশ্বর তাঁকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে বড়বাবু।'

সতীশ রায় চোখ ছোট করলেন, 'কী যা তা বকছ?'

'হ্যাঁ বড়বাবু। কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' মাথা নাড়ল নাগেশ্বর।

সতীশ রায় দ্রুত অন্দরমহলে ঢুকলেন। বারান্দা এবং উঠোনের জমায়েত হওয়া মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন নাগেশ্বর মিথ্যে কথা বলেনি। তাঁকে দেখতে পেয়ে মতির মায়ের কান্না বেড়ে গেল।

'হরিপদ।'

'আজ্ঞে।'

'এসব কী শুনছি? সে কোথায়?'

'অনেক খুঁজে এসেছি, কোথাও পাইনি।'

সতীশ রায় মতির মায়ের দিকে তাকালেন, 'তুমি নিশ্চয়ই জানো সে কোথায় গেছে?'

মাথা নাড়ল মতির মা, 'আমাকে কিছুই বলেনি।'

'বিশ্বাস করি না। তুমিই আদর দিয়ে ওকে বাঁদর করেছ। উঃ। এখন কী করি! সাড়ে সাতটায় লগ্ন। মেয়েটার কাছে আমি মুখ দেখাব কী করে!' তেমনি দ্রুতপায়ে বসার ঘরে চলে এলেন সতীশ রায়। সেখানে তখন বেশ কয়েকজন চিন্তিত মুখে বসে আছে। ঘটকমশাই বললেন, 'বড়বাবু, একবার মালবাজারে ফোন করলে ভালো হয়।'

'ফোন করে কী বলবে?' সতীশ রায় মাথা নাড়লেন।

'বললে হয়, আমাদের পৌঁছাতে একটু দেরি হবে।' ঘটকমশাই বললেন।

'পৌঁছাতে দেরি হবে। যখন পৌঁছাবে তখন কাকে নিয়ে পৌঁছাবে?' সতীশ রায় গজগজ করলেন, 'যত ইয়ার্কিমারা কথাবার্তা।'

গোরক্ষ পাশে গিয়ে দাঁড়াল, 'বড়বাবু, একবার পোস্টমাস্টারের বাড়িতে খোঁজ নিলে হয় না? মানে, ওর মেয়ের জন্যে সত্যচরণ দেবদাস হতে চেয়েছিল তো!'

'ও যদি সেখানে যায় তো সেখানেই থাকুক। এ বাড়িতে সে জীবনে ঢুকতে পারবে না। আমি ভেবে নেবো আমার কোনও ছেলে নেই।' সতীশ রায় ঝপ

করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। হরিপদ দরজায় দাঁড়িয়ে শুনছিল। এগিয়ে এসে চুপিচুপি গোরক্ষকে বলল, 'সেখানে খোকা যায়নি।'

'তুমি জানলে কী করে?' গোরক্ষ সন্দেহের চোখে তাকাল।

'এলোকেশী গিয়েছিল খোঁজ করতে।'

'এলোকেশী সেখানে কেন গিয়েছিল?' গোরক্ষর জেরা।

'যদি খোকাকে ওখানে পাওয়া যায়।' হরিপদ থতমত খেলো।

'আমার বাড়িতে, নাগেশ্বরের বাড়িতে না গিয়ে ওখানে সত্যচরণকে পাওয়া যাবে বলে এলোকেশীর মনে হল?' গোরক্ষ নাছোড়বান্দা।

'আমি তা বলতে পারব না।'

গোরক্ষ নিচু হয়ে সতীশ রায়কে বলল, 'মনে হচ্ছে এটা একটা চক্রান্ত। আর এই চক্রান্তে এলোকেশীও আছে। সে পোস্টমাস্টারের বাড়িতে খোঁজ করতে গিয়েছিল।'

'সেখানে দেখা পেয়েছে?'

'না। বলছে সেখানে যায়নি।'

'তাহলে তো চুকেই গেল। এলোকেশী হরিপদরা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে কেন? কী স্বার্থ ওদের। চক্রান্ত যদি করে থাকে তাহলে ওই বদমাশই করেছে। সে ভেবেছে এই করে পাঁচজনের সামনে আমার মুখ পোড়াবে। তুমি থানায় চলে যাও। বড়বাবুকে আমার নাম বলে অনুরোধ করো যে করে হোক ওকে খুঁজে বের করতে।'

নাগেশ্বর বলল, 'এখনই থানা পুলিশ করবেন বড়বাবু?'

ঘটকমশাই বললেন, 'আর মাত্র দু-ঘণ্টা সময় আছে।

এইসময় টেলিফোন বেজে উঠল। দু-বার রিঙ হতে নাগেশ্বর গিয়ে রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যালো! কে বলছেন?' কান পেতে শুনে সে মাথা নাড়ল, 'না না, এই রওনা হব আমরা। হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। বড়বাবু তৈরি হয়ে গেছেন। ঠিক আছে।' রিসিভার রেখে নাগেশ্বর বলল, 'মিথ্যে বললাম।'

সতীশ রায় তাকালেন।

নাগেশ্বর বলল, 'মেয়ের দাদু। বলল এখনই রওনা হতে। আমি মিথ্যে বললাম।'

'আঃ। ন্যাকামি কোরো না। যেন তুমি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির। কী করি ঘটকবাবু? মাথায় কিছুই আসছে না। এমনভাবে বেইজ্জত করল ছেলেটা!'

এইসময় মঙ্গল ঘরে এল। তাকে দেখে সতীশ রায় বললেন, 'শুনেছ?'

মাথা নাড়ল মঙ্গল, 'একজন বলল ঘণ্টা আড়াই আগে সত্যচরণকে বাসে উঠতে দেখেছে।'

'বাসে উঠেছে? কোন্ বাসে?'

'শিলিগুড়ির বাসে।'

শোনামাত্র সতীশ রায় যেন এলিয়ে পড়লেন।

গোরক্ষ ইশারায় ঘটকমশাই আর নাগেশ্বরকে ডেকে বাইরে চলে এল। ওরা কাছে এলে বলল, 'সে যখন শিলিগুড়ি চলে গিয়েছে তখন আজ রাত্রে তাকে আর পাওয়া যাবে না। কোথায় খুঁজব শিলিগুড়িতে?'

'তার মানে মেয়েটা লগ্নভ্রষ্টা হবে।' ঘটকমশাই বললেন।

'অত্যন্ত অন্যায়।' নাগেশ্বর বলল।

'এখন একটাই উপায় আছে।' মাথা নাড়ল গোরক্ষ।

'কী উপায়?' ঘটকমশাই যেন ডোবার আগে খড়কুটো দেখতে পেলেন।

'একদিন আপনি একটা গল্প বলেছিলেন, মনে আছে? অনেকটা এরকম?'

গোরক্ষর কথায় নাগেশ্বরের মনে পড়ল। 'হ্যাঁ হ্যাঁ। বর পালিয়ে গিয়েছিল। সেই খবর বরের বাবা পাত্রীপক্ষকে দিতে গিয়েছিলেন। তারা জোর করে বরের বাবাকেই বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিয়েছিল। মনে পড়েছে।'

গোরক্ষ বলল, 'আমার মাথায় একটা রাস্তা এসেছে। ছেলে যখন বেপাত্তা হয়ে গেছে তখন মেয়েটার সর্বনাশ না করে বড়বাবু যদি বিয়েটা করে ফেলেন তাহলে সব দিক রক্ষা পায় কী বলেন ঘটকমশাই?'

ঘটকমশাই-এর চোখ বড় হয়ে গেল, 'কিন্তু বয়সের পার্থক্যটা।'

'কী এমন পার্থক্য? তাছাড়া বড়বাবুর শরীর স্বাস্থ্য যে কোনও যুবকের চেয়ে মজবুত। খাওয়াদাওয়া ঘুমোনো সব নিয়ম করে। সন্ধেবেলায় যখন আহ্নিক করতে বসেন তখন দু-গ্লাস খাওয়া হলেই রাতের খাবার খেতে চলে যান।' গোরক্ষ বলল।

'তাছাড়া মেয়েকে পছন্দ হয়েছে বড়বাবুর। সত্যচরণের পছন্দ হয়নি বলে কেটে পড়েছে। বয়স নিয়ে ভাববেন না ঘটকবাবু। হিরের আংটি বেঁকে গেলেও সেটা হিরেরই থাকে। না, এছাড়া আর কোনও রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না আমিও।' বলল নাগেশ্বর, 'ছেলে বিবাগী হল, মানুষটা থাকবে কী নিয়ে?'

ঘটকমশাই বললেন, 'পাত্রীপক্ষ রাজি হবে কিনা সন্দেহ।'

'আরে আগে বড়বাবুকে রাজি করান। তারপর তো পাত্রীপক্ষ।' গোরক্ষ রেগে গেল, 'যান। আপনি বড়বাবুকে আড়ালে ডেকে প্রস্তাবটা দিন।'

'আমি? না না। এ আমি পারব না। একেবারে কাঁচা খেয়ে নিতে পারেন।' ঘটকমশাই বিভ্রান্ত।

নাগেশ্বর বলল, 'ঠিক আছে। তিনজনেই যাচ্ছি কিন্তু যা বলার আপনি বলবেন।'

ওরা এগোল।

এখনও দিনের আলো চারপাশে। মহাদেব সেনের নাতনির বিয়েতে বাড়িটাকে চমৎকার সাজিয়েছে ডেকোরেটাররা। নহবত তৈরি হয়েছে। সন্ধে নামলেই সেখানে সানাই বাজবে, আলোয় ঝলমল করবে বিয়েবাড়ি।

মহাদেব সেন তাঁর ঘরে শেষ মুহূর্তের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। তখনও অতিথিদের আসার সময় হয়নি। দুজন কাজের লোক বাড়ির সামনে টুকটাক কাজ করছিল। তারা দেখতে পেল একটি যুবক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে। যুবকের ভঙ্গিতে একটু সংকোচ থাকায় লোকদুটোর একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই?'

সত্যচরণ দু-পা এগোল, 'কথা বলতে চাই।'

'বলুন কী বলবেন?' দ্বিতীয় লোকটি জানতে চাইল।

'সেকথা আপনাদের বলা যাবে না।' সত্যচরণ কোনওমতে বলতে পারল।

'কী কথা যা আমাদের বলা যাবে না? আপনি কে ভাই?' প্রথমজন বলল।

দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে বললেন চান?'

'ইয়ে, মানে, প্রতিমাকে।'

'প্রতিমাকে? কে আপনি? ওদের আত্মীয়?'

'না না।'

'আপনার মতলব কী বলুন তো? আজ ওর বিয়ে আর আপনি হুট্ করে কোথা থেকে এসে কথা বলতে চাইছেন?'

এইসময় টাকমাথা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এক প্রৌঢ় এগিয়ে এলেন, 'কী ব্যাপার সনাতন?'

প্রথম লোকটি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে প্রৌঢ়ের কানে কানে ব্যাপারটা বলতেই ভদ্রলোক বললেন, 'সর্বনাশ। এই যে, এদিকে এসো।'

সত্যচরণ এগিয়ে গেল। প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি প্রতিমাকে চেনো?'

মাথা নেড়ে সত্যচরণ জানাল হ্যাঁ।

'কী কথা বলতে চাইছ তাকে?'

'একান্তই ব্যক্তিগত।'

'শোন। মেয়েটার আজ বিয়ে। একটু পরেই বর এবং বরযাত্রী এসে যাবে? তারা যদি শোনে বাইরের একজন ব্যক্তিগত কথা বলতে পাত্রীর দেখা চাইছে তাহলে আমাদের কী ভাববে বল তো? তুমি নিশ্চয়ই প্রতিমার ক্ষতি করতে চাও না?'

'না।'

'বাঃ। তাহলে চুপচাপ চলে যাও।'

'আমি কথা বললে ওর কোনও ক্ষতি হবে না।' সত্যচরণ জানাল।

'কিন্তু তোমাকে ওর কাছে যেতে দেওয়া হবে না।'

'এরকম বলবেন না। আমি অনেক ঝুঁকি নিয়ে এসেছি। ওর সঙ্গে কথা না বললে ও খুব বিপদে পড়বে। আমাকে বাধা দেবেন না।' কাঁদো কাঁদো হল সত্যচরণ।

ভদ্রলোক বুঝলেন মামলা বেশ জটিল। একে এখনই মেরে ধরে বের করে দেওয়া যায়। কিন্তু তাতে পাড়ার লোক কৌতূহলী হয়ে উঠবে। গুজব ছড়াবে। প্রৌঢ় বললেন, 'আমি মেয়ের কাকা। তুমি এখানে অপেক্ষা করো আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত।'

প্রৌঢ় ভেতরে গেলেন। ভেতরের উঠোনে তখন ছাঁদনাতলায় আলপনা দেওয়া হচ্ছে। চারপাশে মেয়েদের ভিড়। প্রতিমার মা এবং দিদিমাকে ডেকে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকে প্রৌঢ় জানালেন সমস্যার কথা।

দিদিমা বললেন, 'সর্বনাশ। ছেলেটা কে?'

'নাম বলছে না। জেদ ধরে আছে প্রতিমার সঙ্গে কথা বলবে বলে।' প্রৌঢ় বললেন, 'তোমরা কেউ জানতে না বউদি?'

প্রতিমার মা মাথা নাড়লেন, 'না।'

'তোমার মেয়ে নিশ্চয়ই এই ছেলেটার সঙ্গে ভাব করেছিল। বিয়ের খবর পেয়ে ছুটে এসেছে ছোকরা।' প্রৌঢ় বললেন।

'আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ঠাকুরপো। কী হবে এখন?'

'মেরেধরে বের করে দিতে পারি—।' প্রৌঢ় বললেন।

'না না। মা, আপনি বাবাকে বলুন।' প্রতিমার মা বললেন।

'উনি কী করবেন। যেরকম নার্ভাস মানুষ। ডাকো প্রতিমাকে। আচ্ছা, আমিই ডেকে আনছি।' বৃদ্ধা বেরিয়ে গেলেন।

প্রতিমার মা বললেন, 'ছেলেপক্ষ যদি জানতে পারে—!'

'বিয়ে ভেঙে দিয়ে চলে যাবে। একটু আগে তোমার শ্বশুরমশাই ওদের ফোন করেছিলেন। ওরা এখনও বের হয়নি। কী জানি, এই ছোকরা তাদের খবর দিল কিনা! দিয়েছে বলে হয়তো ভাবছে আসবে কিনা!'

প্রতিমার মা মাথা নাড়লেন, 'ও যে এরকম কিছু করেছিল তা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'আজকালকার মেয়ে, ওদের মুখ দেখে বোঝা যায় না পেটে কী আছে?' প্রৌঢ় মাতব্বরের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন।

দিদিমা প্রতিমাকে নিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রতিমার মা, 'তোর পেটে পেটে এত? এইভাবে আমাদের সর্বনাশ করলি?'

'কী বাজে বকছ?'

'বাজে বকছি?' মারার জন্যে হাত তুললেন প্রতিমার মা।

প্রৌঢ় বললেন, 'থাক থাক। বউদি এত মাথা গরম কোরো না। শোনো, সত্যি কথা বলো, তুমি কি কোনও ছেলের সঙ্গে ভাব করেছ?'

'আমার কি মাথা খারাপ?'

'তার মানে?'

'এখানকার সবকটা ছেলে মাকাল ফল।'

'তাহলে যে এসেছে সে আসবে কেন?'

'কে এসেছে?'

'একটি ছেলে। রোগা, লম্বা, ভালো দেখতে।'

'দূর। সে কী বলেছে?' খেঁকিয়ে উঠল প্রতিমা।

'তোমাকে ব্যক্তিগত কথা বলতে চায়।' প্রৌঢ় বললেন।

'তার মানে এই বিয়ে ভাঙতে চায়।' দিদিমা বললেন।

'চলো তো দেখি, কে এসেছে।'

'খবরদার। একদম বাইরে যাবি না।' প্রতিমার মা মেয়ের হাত ধরল।

'আশ্চর্য। যাকে চিনি না জানি না সে ব্যক্তিগত কথা বলতে আসবে কেন?'

প্রৌঢ় বললেন, 'কিন্তু সে বলছে তোকে চেনে। হয় সে মিথ্যে বলছে নয় তুই বলছিস। বাইরে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বললে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।'

'কী কেলেঙ্কারি হবে?' কীরকম মিইয়ে গেল প্রতিমা।

'যদি তোকে বিয়ে করতে নিষেধ করে, যদি কান্নাকাটি করে তাহলে লোকজন হাসাহাসি করবে। তোর দাদুর কথা ভাব। বিয়ে ভেঙে গেলে ওঁর হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে।' প্রৌঢ় মাথা নাড়লেন, 'একটা ছেলে তো কোনও কারণ ছাড়াই এত সাহস দেখাতে পারে না।'

দিদিমা বললেন, 'ছেলের বাপের কথা ভাব। তোকে কী পছন্দ করেছেন। তোর মুখে গালাগালি শুনতে চেয়েছিলেন বলে আমরা অবাক হয়েছিলাম। পরে বুঝতে পেরেছি মানুষটা আমুদে। তা গালাগাল শোনা এক কথা কিন্তু যাকে ছেলের বউ করে নিয়ে যাবেন তার চরিত্রে যদি কলঙ্ক থাকে তাহলে কিছুতেই মেনে নেবেন না।'

'তোমরা কী যা তা বলছ! আমি কী করেছি যে কলঙ্ক থাকবে?' প্রায় চিৎকার করে উঠল প্রতিমা।

'তুমি কিছুই করোনি। এখন দয়া করে নিজের ঘরে যাও। সেখানে কেউ যেন বুঝতে না পারে এসব ঘটনা ঘটেছে। এটুকু করো তাহলেই হবে।' প্রতিমার মা বললেন।

বোঝা গেল অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিমা ফিরে গেল তার ঘরে যেখানে বান্ধবীরা তাকে সাজাচ্ছিল। দিদিমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হবে?'

'একটাই রাস্তা আছে।' প্রৌঢ় চোখ বন্ধ করলেন।

'কী?' প্রতিমার মা শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি ওকে চিলেকোঠার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি খানিকটা দড়ি আর প্লাস্টার নিয়ে ওখানে চলে এসো তাড়াতাড়ি।' প্রৌঢ় প্রতিমার মাকে কথাগুলো বলে দ্রুত পা বাড়ালেন।

⁂

সত্যচরণ ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। প্রৌঢ়কে আসতে দেখে বলল, 'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, সে কোথায়?'

'ওপরে। আমার সঙ্গে এসো। কেউ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেবে না।'

'কেন?'

'আঃ। তোমার কি বাস্তববুদ্ধি নেই? বিয়ের কনে কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত কথা বলছে জানলে চারধারে হই-চই পড়ে যাবে, এটা বোঝ না? এসো।' প্রৌঢ় এগোলেন। পেছনে সত্যচরণ। দোতলায় উঠে একটু দাঁড়ালেন। ইশারায় বললেন সত্যচরণকে থামতে। তারপর উঁকি মেরে দরজা থেকে ঘরের ভেতরটা দেখলেন। মহাদেব সেন পেছন ফিরে ফোন করছেন। সত্যচরণকে নিয়ে দ্রুত দরজা পেরিয়ে ছাদের সিঁড়ি ধরলেন প্রৌঢ়।

ছাদটি বেশ বড়। ওপরে উঠে দেখলেন প্রতিমার মা ততক্ষণে সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। চিলেকোঠার ঘরের দরজা খুলে আলো জ্বেলে একটা চেয়ার টেনে প্রৌঢ় বললেন, 'বোসো।'

'সে কোথায়?' সত্যচরণ সরল গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'বউদি—!' প্রৌঢ় ডাকলেন।

প্রতিমার মা ঘরে ঢুকলেন। তাঁর মুখে ক্রোধ এবং বিরক্তি স্পষ্ট।

'ওর মা এসেছেন, এবার ও আসবে। তুমি আগে বোসো।' প্রৌঢ় বলতেই সত্যচরণ বসল। সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতদুটো পেছনে নিয়ে এসে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললেন প্রৌঢ়।

'একি! এ কী করছেন?' সত্যচরণ উঠে দাঁড়াতে গেল।

'চোপ! একটাও কথা নয়।' বলতে বলতে প্লাস্টার অনেকখানি খুলে সত্যচরণের মুখে মাথায় জড়িয়ে দিলেন এমনভাবে যাতে কোনমতে সে একটিও শব্দ যেন না করতে পারে। তারপর বাকি দড়ি দিয়ে পা বাঁধলেন; শরীর জড়িয়ে দিলেন চেয়ারের সঙ্গে।

সত্যচরণ তখন প্রবল চেষ্টা করছে দড়ি খোলার। কিন্তু চাপা গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া কিছুই বেরুচ্ছে না।

তার কান ধরলেন প্রৌঢ়। মন দিয়ে শোন। এখানে চুপচাপ বসে থাকো। বিয়েটা চুকে যাক, নিমন্ত্রিতরা বাড়ি ফিরে যাক, তারপর এসে তোমাকে নামিয়ে গেটের বাইরে ছেড়ে দেব। তোমার বাপের ভাগ্য ভাল তাই গায়ে হাত তুললাম না। চল বউদি।' ঘরের বাইরে এসে শেকল তুলে দিলেন প্রৌঢ়।

প্রতিমার মা বললেন,'বেশি বয়স নয়। দেখে মনে হল বেশ নিরীহ।'

'আগে কখনও দেখেছ?'

'না।'

'ওকে সামলানোর উপায় আর কিছু ছিল না। চল নিচে চল, বরযাত্রীরা

এসে পড়ল বলে।' ওরা নিচে নেমে এলেন। আসার সময় দেখলেন মহাদেব সেন তার ঘরে নেই এবং তখনই সানাই বেজে উঠল। আলো জ্বলল। বিয়েবাড়ি জমজমাট।

মহাদেব সেন ঘড়ি দেখছিলেন। পুরুতমশাই এসে বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো। সাতটা পনেরো হয়ে গেল। লগ্নের তো দেরি নেই। ওরা এলে আশীর্বাদ হবে তারপরে বিয়ে। এত দেরি করছে কেন?'

সেইসময় প্রৌঢ় এসে দাঁড়ালেন। দুজন অতিথিকে আপ্যায়ন করে এসে প্রৌঢ়কে বললেন মহাদেব সেন, 'ডুডুয়াতে ফোন করছি, ফোন এনগেজড। ওদের তো অনেক আগেই চলে আসার কথা। তুমি একটু থানায় ফোন করো তো?'

'থানা?' প্রৌঢ় অবাক হলেন।

'একমাত্র দুর্ঘটনা না ঘটলে ওদের এখনও না আসার কোনও কারণ নেই।' মহাদেব সেন বললেন, 'বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার। বলেছিলাম রওনা হওয়ার সময় একটু ফোন করবেন। তাও করেনি।'

'সর্বনাশ।' প্রৌঢ় বলে ফেললেন, 'শয়তানটা তাহলে প্রথমে ওখানেই গেছে।'

'মানে? কি বলছ তুমি?' মহাদেব সেন হতভম্ব।

'না না। আমি দেখছি, ফোন করছি।' প্রৌঢ় ছুটলেন থানায় ফোন করতে।

※

ঘটকমশাই-এর কথা শুনে যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না সতীশ রায়। তাঁর শরীর কুঁকড়ে গেল।

সেটা লক্ষ করে নাগেশ্বর উৎসাহ পেল, 'আপনি মহান মানুষ। আজ আর একটু মহান হোন। মেয়েটাকে রক্ষে করুন। লগ্নভ্রষ্টা হলে আর বিয়ে হবে না এ জীবনে। মেয়েটা তো কোনও অন্যায় করেনি!'

গোরক্ষ বলল, 'বয়সের কথা একদম চিন্তা করবেন না বড়বাবু। পুরুষমানুষ যদ্দিন সক্ষম তদ্দিন যুবক। এই সংসার খাঁ খাঁ করছে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। তাই এমন সুযোগ করে দিয়েছেন।'

পাশে রাখা ফোনের রিসিভারটাকে নিচে নামিয়ে রেখে সতীশ রায় গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোমরা এখন এখান থেকে যাও।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এতবড় সিদ্ধান্ত নিতে হলে একটু ভাবতেই হবে। চল সবাই। বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করি।'

হরিপদ দরজায় দাঁড়িয়ে শুনছিল। ওরা বেরিয়ে আসছে দেখে সে দৌড়াল ভেতরে। যে সমস্ত মহিলারা অনুষ্ঠান উপলক্ষে এ-বাড়িতে এসেছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই চুপচাপ ফিরে গেছেন। মতির মা মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। তার পাশে এলোকেশী। হরিপদ ঢুকে বলল, 'বিয়ে হচ্ছে।'

'হচ্ছে?' এলোকেশী লাফিয়ে উঠল,'খোকা ফিরেছে?'

'না।' সে তো এখন শিলিগুড়িতে।'

'তাহলে?' হকচকিয়ে যায় সবাই।

'মেয়ে যাতে লগ্নভ্রষ্টা না হয় তাই সবার অনুরোধ বড়বাবু রাজি হয়েছেন।' হরিপদ ঘোষণা করা মাত্র কয়েকটি গলা থেকে আওয়াজ বেরিয়ে এল, 'অ্যাঁ?'

এলোকেশী বলল, 'হায় ভগবান। বড়বাবুর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

'কী করবেন উনি? সবাই মিলে ধরল।' হরিপদ বলল।

'সবাই যদি বলে আত্মহত্যা করুন উনি করবেন? ছি ছি ছি। মেয়ের বয়সী বলে একটুও ভাবলেন না?' এলোকেশী মাথা নাড়তে লাগল।

একজন প্রৌঢ়া বললেন, 'এই জন্যে বলে চিতায় উঠলেও পুরুষজাতটাকে বিশ্বাস কোরো না, ছাই না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। ছেলের বউ হতে যাচ্ছিল যে, তাকে নিজের বিছানায় বউ করে তুলতে ব্যাটাছেলেরাই পারে।'

এলোকেশী বলল, 'হরিপদদা, আমি চললাম।'

'সেকি? কোথায়?' হরিপদ অবাক।'

'এরপর এ বাড়িতে থাকব না। থাকতে পারব না।'

'চুপচাপ চলে যেও না, বড়বাবুকে বলে যাও।' হরিপদ উপদেশ দিল।

'তাই যাব।' বলে, দুমদাম পা ফেলে এলোকেশী সতীশ রায়ের ঘরের সামনে চলে এল। দূরে দাঁড়িয়ে নাগেশ্বররা গুলতানি মারছে। তাদের উপেক্ষা করে ঘরে ঢুকল এলোকেশী।

'বড়বাবু!'

সতীশ রায় চোখ তুললেন।

'আমি চলে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'শ্বশুরবাড়ি।'

'সেকি? কেন?'

'আর আমার এখানে থাকা সম্ভব নয়।'

'দ্যাখো এলোকেশী, আমি এখন ভয়ঙ্কর সমস্যায় আছি। এইসময় এখানে এসে এসব কথা বলতে লজ্জা করল না তোমার?' কড়া গলায় বললেন সতীশ রায়।

'না। করল না। শ্বশুরবাড়িতে গেলে আমি ভাসুর দেওরের শিকার হব। সেটা ঢের ভালো। আপনার পদস্খলন তো দেখতে হবে না।' এলোকেশী বলল।

'কী যা তা বলছ?' চমকে উঠলেন সতীশ রায়।

'ছোটমুখে বড় কথা না বলে পারছি না।'

'খুব বাড়াবাড়ি করছ তুমি। যাও, দূর হয়ে যাও।'

'নিশ্চয়ই যাব। আপনার নতুন সংসারে রাঁধুনি হয়ে থাকব না।' এলোকেশী বেরিয়ে যাচ্ছিল। সতীশ রায় বললেন, 'দাঁড়াও। নতুন সংসার মানে?'

এলোকেশী দাঁড়াল, 'ছেলের বদলে নিজে বিয়ে করতে যাচ্ছেন সংসার পাতবেন বলে, সেটা তো নিজেরই সংসার।'

'উঃ। কে বলল একথা? আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এই হারামজাদা দুটোকে তাড়াতে হবে। হরিপদ, হরিপদ।'

দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হরিপদ, 'আজ্ঞে।'

'গাড়ি রেডি করতে বল, আর ঘটকবাবুকে ডাক।'

এলোকেশী হতবাক। কী শুনছে সে? তাহলে কি হরিপদ মিথ্যে বলেছিল? লজ্জায় কুঁকড়ে গেল সে।

ঘটকমশাই দৌড়ে এলেন। সতীশ রায় বললেন, 'চলুন।'

'তাহলে সবাইকে তৈরি হতে বলি।' ঘটকমশাই উৎফুল্ল।

'না। কেউ যাবে না। শুধু তুমি আমার সঙ্গে যাবে। এসো।' সতীশ রায় বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। নাগেশ্বর পেছনে দৌড়াল, 'আমরাও যাব না?'

'না।'

ড্রাইভারের পাশে ঘটকমশাই পেছনে সতীশ রায়। গাড়ি চালু হলে সতীশ রায় বললেন, 'অন্যদিন নিষেধ করি, আজ বলছি একটু জোরে চালাও।'

ড্রাইভার মাথা নাড়ল।

গাড়ি ছুটছে। একটু উসখুস করে ঘটকমশাই বললেন, 'ওদের কাউকে আনলেন না। সাক্ষী হিসেবে ওরা থাকলে ভাল হত।'

'আমি কেন যাচ্ছি ঘটকবাবু?'

'প্রথমে ভেবেছিলাম যা, তা এখন ভারতে অসুবিধে হচ্ছে।'

'আমি যাচ্ছি ক্ষমা চাইতে। আমার ছেলে যে অন্যায় করেছে তার সব দায় আমার। এজন্যে যে শাস্তি ওঁরা দেবেন তা মাথা পেতে নেব। মেয়ে যদি আজ লগ্নভ্রষ্টা হয় তাহলে ওই কুলাঙ্গারকে ত্যাজ্যপুত্র করে এই মেয়েকে আইন মাফিক দত্তক নিয়ে আমার সমস্ত সম্পত্তি ওর নামে লিখে দেব।' সতীশ রায় জোরে জোরে বলছিলেন।

ঘটকমশাই কথা বললেন না। এরপর কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

দূর থেকে গাড়ি দেখে কেউ চিৎকার করে উঠল; 'এসেছে, এসেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বাজতে লাগল। উলুধ্বনি শুরু হয়ে গেল।

গাড়িতে বসে ওই শব্দ শুনে আরও কুঁকড়ে গেলেন সতীশ রায়। গেটের সামনে গাড়ি থামতেই ঘটকমশাই আগে নামলেন, দেখলেন কয়েকজন এয়ো বরণডালা নিয়ে এগিয়ে আসছেন বরকে বরণ করতে।

'দাঁড়ান দাঁড়ান। এই গাড়িতে বর আসেনি।' ঘটকমশাই চিৎকার করতে সবাই থেমে গেল। সতীশ রায় নামলেন।

মহাদেব সেন এগিয়ে এলেন, 'আসুন আসুন। আপনাদের দেরি দেখে চিন্তায় প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ছিলাম। বরের গাড়ি কি পেছনে?'

'আপনার সঙ্গে কথা আছে, একটু—!' সতীশ রায় থেমে গেলেন।

নিশ্চয়ই। সতীশ রায়কে নিয়ে প্যান্ডেলের অন্যপ্রান্তের নির্জনে চলে গেলেন মহাদেব সেন। প্রতিমার কাকা বিড়বিড় করলেন, 'এবার নিশ্চয়ই ছেলেটার কথা বলবে।'

মহাদেব সেন বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'আমার ছেলেকে বিকেল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' সতীশ রায় খুব নিচু গলায় বললেন, 'আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

কানে ঢুকলেও অর্থবহ হচ্ছিল না কথাগুলো, 'কী বলছেন?'

'আমরা সর্বত্র খুঁজেছি। এ আমার অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। সে যে বিয়ে করতে রাজি নয় তা কখনও আমাকে জানায়নি।'

মহাদেববাবুর মুখের অবস্থা দেখে প্রৌঢ় এসে দাঁড়িয়েছিলেন পাশে।

মহাদেববাবু বললেন, 'ও কালীপদ, আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। বর নাকি বিয়ে করবে না বলে উধাও হয়ে গেছে।'

'সেকি! আপনি কে?' কালীপদবাবু প্রশ্ন করলেন।

'আমারই ছেলে।'

'লজ্জা করছে না আপনার। ছেলে বিয়ে করবে না তা আগে জানতেন না?'

মাথা নেড়ে না বললেন সতীশ রায়।

'কখনও জিজ্ঞাসা করেছেন?'

'আমাকে অমান্য করে না। তাই—।'

'এখন কী করবেন বলুন? আমাদের মানসম্মান, এত খরচ সব আপনার ছেলের জন্যে জলে যাবে? মেয়েটার বিয়ে যদি আজ না হয় পরে কোনও পাত্র তাকে বিয়ে করতে চাইবে? আপনাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।' কালীপদ চেঁচালেন।

ভিড় জমে গেল। কেউ বলল, নিশ্চয়ই অন্য মেয়ের সঙ্গে ভাব ছিল, তাই বিয়ে না করে কেটে পড়েছে। কেউ বলল, জোর করে বিয়ে দিতে চাইলে এইরকম হয়।

খবরটা ভেতর-বাড়িতে পৌঁছাতে দেরি হল না। প্রতিমার মা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। সানাই বন্ধ হল, নিভে গেল বাড়তি আলোগুলো।

মহাদেব সেনকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। ইতিমধ্যে যাঁরা খেতে বসে গিয়েছিলেন তাঁরা দ্রুত হাত চালালেন, কেউ কেউ উঠে গেলেন।

সতীশ রায় নিজেকে খুনের আসামি মনে করছিলেন। তিনি হাতজোড় করে কালীপদবাবুকে বললেন, 'আপনারা ক্ষতিপূরণ হিসেবে যা চান তা আমি দিতে প্রস্তুত।'

'এখন বলছেন। পরে হাওয়া হয়ে যাবেন।' কালীপদবাবু বললেন।

'বেশ। আমি এখনই লিখে দিচ্ছি। আমার যা আছে তার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হবে প্রতিমা। ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করে ওকে আমি আইনসম্মতভাবে দত্তক নিতে তৈরি আছি।' সতীশ রায় বললেন।

'চমৎকার। আমাদের মেয়ে কি জলে পড়ে আছে যে আপনি তাকে দত্তক নেবেন?' কালীপদবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আপনারা তো সবাই শুনলেন। এখন কী করা যায়?'

ঘটকমশাই এতক্ষণে কথা বললেন, 'উনি এত কষ্ট পেয়েছেন যে এখানে ছুটে না এসে পারেননি। ইচ্ছে করলে তো না-ও আসতে পারতেন।'

'আঃ। এখন ওর কথা হচ্ছে না। এই মালবাজারে কোনও ভালো ছেলের

সন্ধান জানেন যে আমার ভাইঝিকে আজ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে!'

কালীপদবাবুর কথা শুনে সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। একজন বলল, 'এভাবে রেডিমেড জামাই পাওয়া কী যায়?'

একটি বালক এসে কালীপদবাবুকে বলল, 'আপনাকে ভেতরে ডাকছে।'

ভেতরে এলেন কালিপদবাবু। দেখলেন কনের সাজগোজ খুলে ফেলেছে প্রতিমা। তার চোখ জ্বলছে। মহাদেব সেনের স্ত্রী বললেন, 'এখন কী হবে বাবা?'

'ওই লগ্নভ্রষ্ট হওয়ার ব্যাপারটাকে যদি আমল না দেন তাহলে বলব দুশ্চিন্তার কিছু নেই। যা খরচ হয়েছে তা ওই সতীশ রায়ের কাছ থেকে আদায় করে নেব।'

'কিন্তু তারপর। তারপর মেয়ের বিয়ে হবে?' প্রতিমার মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন।

'বিয়ে করতেই হবে তার কি মানে আছে? কাকাবাবু তো বিয়ে করেননি।' বেশ জোরে জোরে বলল প্রতিমা।

'চুপ কর। যখনই ওই ছোকরা এসেছে তখনই আমার ডানচোখ কেঁপে উঠেছিল। মন বলছিল খারাপ কিছু না হয়।' প্রতিমার মা বললেন।

'আশ্চর্য! যাকে চিনি না জানি না সে যদি এসে কথা বলতে চায় তো আমি কী করব? তোমরা আমাকে মিছিমিছি দোষ দিচ্ছ।' প্রতিমা বলল।

কালীপদবাবুর মাথায় তখনই ভাবনাটা চলকে উঠল, 'হ্যাঁরে, ওর নাম কি?'

'কী মুশকিল! আমি কী করে জানব?'

'তুই জানিস না?'

'না। কী বলেছে সে?'

'তোর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। ব্যক্তিগত কথা।'

মহাদেব সেনের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছেলেটা কী করে? কী নাম?'

'কিছুই বলেনি।'

'তুমি সেসব জিজ্ঞাসা করবে তো?'

'একটা উটকো ছেলে যাকে প্রতিমা চেনে না তাকে জিজ্ঞাসা করে কী করব? ভেবেছিলাম বিয়ে চুকে গেলে বিদায় করে দেব।' কালীপদবাবু বললেন।

'দ্যাখো না কথা বলে। যদি ভালো ছেলে হয়।' মহাদেববাবুর স্ত্রী বললেন।

'ভালো কিনা জানি না, তবে সরল। বলছেন যখন—।' পা বাড়ালেন তিনি।

প্রতিমা ফুঁসে উঠল, 'অসম্ভব। যার তার সঙ্গে তোমরা আমার বিয়ে দিতে পার না। আমি কি এতই ফ্যালনা?'

ততক্ষণে সিঁড়িতে পা রেখেছেন কালীপদবাবু। পেছনে প্রতিমার মা।

দরজা খুলতেই দেখা গেল মাথা নিচু করে বসে আছে সত্যচরণ। কেউ ঘরে ঢুকেছে বুঝতে পেরে তাকাল সে। কালীপদবাবু ওর মুখ থেকে টেপ খুলে নিলেন। ঠোঁট চাটল সত্যচরণ।

'তোমার বাড়ি কোথায়?' কালীপদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

'কেন?'

'যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও।'

'দেব না। আপনি আমার ওপর অত্যাচার করেছেন।'

'বেশ করেছি। কি করো তুমি?'

'কিছু করি না। বেকার।'

'বাঃ। বাবার নাম কি?'

'বলব না।'

বউদির দিকে তাকিয়ে কালীপদবাবু বললেন, 'দেখেছ কীরকম ত্যাঁদোড়।

প্রতিমার মা এগিয়ে এলেন, 'আমি প্রতিমার মা। ওকে কী কথা বলতে তুমি এসেছিলে তা আমাকে স্বচ্ছন্দে বলতে পারো।'

সত্যচরণের হাত পা তখনও বাঁধা। সে একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, 'থাক।'

'না। তুমি বলো। আমি তোমার মায়ের মতো।'

সত্যচরণ তাকাল। একবার ঠোঁট কামড়াল। তারপর মুখ নিচু করে বলল, 'আমি ক্ষমা চাইতে এসেছিলাম।'

'ক্ষমা চাইতে? তুমি কী অন্যায় করেছিলে?' প্রতিমার মা অবাক।

'না। অন্যায় নয়। ও যখন ওর দাদুর সঙ্গে আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল তখনই আমার ওকে বলা উচিত ছিল।' থেমে গেল সত্যচরণ।

'তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল? তোমাদের বাড়ি কি ডুডুয়ায়?' উত্তেজিত হলেন প্রতিমার মা।

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল সত্যচরণ।

'তোমার বাবার নাম কি সতীশ রায়?' গলার কাছে হৃৎপিণ্ড যেন চলে এসেছে প্রতিমার মায়ের। দেওরের দিকে তাকালেন তিনি।

'হ্যাঁ।'

কালীপদবাবু বললেন, 'সর্বনাশ। তুমিই সত্যচরণ?'

'হুঁ।'

দ্রুত বাঁধন খুলে দিলেন কালীপদবাবু, 'একথা আগে বলবে তো?'

'আপনি জিজ্ঞাসা করেননি।'

'ওঠো ওঠো।' হাত ধরে সত্যচরণকে তুলে কালীপদ বউদিকে বললেন, 'তুমি ওকে দোতলার ঘরে নিয়ে গিয়ে রেডি করে দাও? আমি ছুটছি।'

কালীপদবাবু ছুটলেন। সত্যচরণ বলল, 'কিন্তু—।'

'কোনও কিন্তু নয় বাবা। আমার মেয়ে লগ্নভ্রষ্টা হতে চলেছে। তুমি তার সম্মান রক্ষা করো। তোমার যা বলার আছে বিয়ের পর বোলো।' প্রতিমার মা হাত ধরে সত্যচরণকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন।

'কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না আমার পক্ষে বিয়ে করা অত্যন্ত অন্যায় কাজ হবে। আমার মনের কৌমার্য নেই।' মাথা নাড়ল সত্যচরণ।

'মনের কৌমার্য? সেটা আবার কী?' হকচকিয়ে গেলেন প্রতিমার মা।

'একজনকে দেখে আমার মনে অনুরাগ এসেছে।'

'অ্যাঁ। কারও সঙ্গে তুমি প্রেম করছ?'

'না না। সে করেনি। তার বিয়ে হয়েছিল, বিধবাও হয়ে গেছে বেচারা। কিন্তু আমি মনে মনে তাকে মন দিয়ে ফেলেছি। এই অবস্থায় কি অন্য কোনও মেয়েকে বিয়ে করা উচিত? আপনি বলুন। এই কথাটাই প্রতিমাকে বলতে এসেছিলাম।'

'বাড়িতে না জানিয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ। জানালে আসতে দিত না।'

'তোমাদের ডুডুয়ার মেয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'কতটা এগিয়েছিলে তোমরা?'

'না না। ও আমাকে চিনত না, কথাই হয়নি কখনও।'

বুক থেকে পাথর নেমে গেল প্রতিমার মায়ের। ঠিক সেইসময় সানাই বেজে উঠল নতুন করে। আলো জ্বলল। প্রতিমার মা বললেন, 'মাকে বললে সব ঠিক হয়ে যায়। এখন একথা কাউকে বলতে হবে না। দয়া করে আমাকে বাঁচাও।'

'ছি ছি, এ কী বলছেন আপনি! আমি কী করে আপনাকে বাঁচাব!'

'আমি যা বলছি তাই শুনবে, তাহলেই হবে।' প্রতিমার মা সত্যচরণকে হাত ধরে নিয়ে চললেন।

আবার সানাই বাজছে, আলো জ্বলল, সতীশ রায় অবাক হলেন। ঘটকমশাই কাছে এসে বললেন, 'যাক বাঁচা গেল। শেষ ভালো যার সব ভালো।'

'কীরকম?' সতীশ রায় বিধ্বস্ত কিন্তু না জিজ্ঞাসা করে পারলেন না।

'এরা পাত্র পেয়ে গেছেন। এই বিপদে কোনও যুবক মেয়েকে লগ্নভ্রষ্টা না করতে এগিয়ে এসেছেন। খুব বড় মন না হলে এমন কেউ করে না।' ঘটকমশাই বললেন।

'কিন্তু লগ্ন তো চলে গেছে!'

'না। পুরুতমশাই বলছেন রাত নটা থেকে সওয়া নটায় বিয়ে দেওয়া যেতে পারে।'

'উঃ। ভগবান। তুমি বাঁচালে।' চোখ বন্ধ করলেন সতীশ রায়, 'নইলে সারাজীবন আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতাম না।'

মহাদেব সেন শুয়ে ছিলেন। সানাই বাজছে শুনে উঠে বসতে না বসতেই কালীপদবাবু চলে এলেন, 'চলুন। সব ঠিক হয়ে গেছে।'

মহাদেববাবুর স্ত্রীও হাসিমুখে ঢুকলেন, 'রাখে হরি মারে কে! নাও, ওঠো, বাকি কাজগুলো শক্ত হয়ে শেষ করো।'

'কিন্তু পাত্র পেলে কোথায়?'

পাত্র এ-বাড়িতেই ছিল। মহাদেব সেনের স্ত্রী হাসলেন আবার।

'কী বলছ? এ-বাড়িতেই ছিল মানে?' মহাদেব সেন বিরক্ত হলেন, 'কোন্ বংশের ছেলে, চালচুলো আছে কিনা খোঁজ না নিয়েই সানাই বাজিয়ে দিলে তোমরা?'

কালীপদবাবু মহাদেব সেনের পাশে বসে বিকেলের ঘটনাটা জানালেন নিচু গলায়। সব শুনে মহাদেব সেন হতভম্ব, 'ছি ছি। এ কি করেছ তোমরা?'

'কোনও অন্যায় করিনি। কেউ যদি নিজের পরিচয় না দেয় তাহলে কী করে ভাবব বিয়ের পাত্র একা বিয়ে বাড়িতে চলে এসেছে দুঘণ্টা আগে? এরকম কেউ কোথাও শুনেছে? আমরা ভেবেছি ছোকরা প্রতিমার বিয়ে ভেঙে দিতে চায়। ওকে তো চিনি না।' কালীপদ নিজেদের পক্ষে সওয়াল করলেন।

'ইস্। আমি যদি তখন দেখতাম। তোমরা আমাকে কিছু না জানিয়ে খুব

অন্যায় করেছ। প্রতিমা দ্যাখেনি ওকে?' মহাদেব সেন খুব বিব্রত।

'না। সে বাইরে আসেনি।' মহাদেব সেনের স্ত্রী বললেন।

'এখন সতীশবাবুকে কী বলব? ওঁকে ওভাবে অপমান করা হল। ছি।'

'আপনি কিছু ভাববেন না, আমি সব ম্যানেজ করে নেব। আপনি এখানেই বিশ্রাম নিন, আশীর্বাদ করার সময় খবর পাঠাব।' কালীপদবাবু বললেন।

'তা হয় না। আমিও নিচে নামছি। দেখি—! কিন্তু তোমরা নিশ্চিত তো ছেলেটি সত্যচরণ?' কালীপদবাবুর মুখের দিকে তাকালেন মহাদেব সেন।

'সেন্ট পার্সেন্ট।' কালীপদবাবু বেরিয়ে গেলেন।

আবার বিয়েবাড়ি জমে উঠেছে। যারা খাওয়া ছেড়ে উঠে এসেছিল তারা নতুন করে খেতে বসেছে। একটি তরুণ ট্রে-তে করে শরবত এনে সতীশ রায়ের সামনে ধরল। সতীশ রায় মাথা নেড়ে না বললেন, ঘটকমশাই তুলে নিলেন গ্লাস। এইসময় মহাদেব সেন সামনে এলেন, 'একি! সরবত খেলেন না?'

'নাঃ।' সতীশ রায় বললেন,'শুনলাম একটি সুপাত্র পাওয়া গেছে!'

'হ্যাঁ। বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি।' মহাদেব সেন সতীশ রায়ের হাত ধরলেন, 'তখন উত্তেজনাবশত অনেক কুকথা বলা হয়েছে, আপনি মার্জনা করুন।'

'ছি ছি! একি বলছেন। আপনি আমার পিতৃতুল্য। যে অন্যায় আমার দিক থেকে হয়েছে তাতে—। যাক্। একটাই সান্ত্বনা যে প্রতিমা মা পাত্রস্থ হতে চলেছেন।'

এইসময় কালীপদবাবু এসে বললেন, 'আসুন, মেয়েকে আশীর্বাদ করবেন।'

মহাদেব সেন সতীশ রায়কে বললেন, 'চলুন।'

'না না। সেই যোগ্যতা আমি হারিয়েছি। আমাকে বলবেন না।'

'একটু আগেই আপনি প্রতিমাকে মা বললেন। সে আপনার কাছে যেমন ছিল তেমন আছে। তার নতুন জীবনের শুরুতে আপনি আশীর্বাদ জানাবেন না? চলুন।'

মহাদেব সেনের কথায় আবেগে আক্রান্ত হলেন সতীশ রায়।

কয়েক পা হেঁটে খেয়াল হল। বরযাত্রী এবং বরকে সঙ্গে নিয়ে বিয়ে বাড়িতে আসবেন বলে তৈরি হওয়ার সময় আলমারি থেকে হারটা বের করে পকেটে রেখেছিলেন। এতক্ষণের ডামাডোলে সেকথা ভুলেই গিয়েছিলেন। এখন মনে হল, ভাগ্যিস ভুলে গিয়েছিলেন, নইলে মনে থাকলে বিয়ে হচ্ছে না বলে

বাড়িতেই হার রেখে আসতেন!

প্রতিমা বসে আছে মুখ নিচু করে কনের সাজে সেজে। তাকে ঘিরে অল্পবয়সি মেয়েরা, মহিলারা। কালীপদবাবু বললেন, 'রায়মশাই, আপনি প্রথমে আশীর্বাদ করুন।'

'আমি কেন? পাত্রের বাবা কোথায়?'

'বুঝতেই পারছেন, হঠাৎ বিয়ে হচ্ছে। ওঁরা দূরে থাকেন।'

'ও।'

পুরোহিত প্রথমে আশীর্বাদ করলেন। তারপর সতীশ রায় ধানদুর্বো দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। প্রতিমা মুখ তুলে তাকাতেই সতীশ রায়ের বুক মুচড়ে উঠল। কোথায় যাওয়ার কথা অথচ এই মেয়ে কোথায় যাচ্ছে! শঙ্খ বাজাল মেয়েরা। একটু ইতস্তত করে পকেট থেকে হারের বাক্সটা বের করে এগিয়ে ধরলেন সতীশ রায়, 'মা, তোমার জন্যে এটাকে রেখেছিলাম। এই নাও।'

বাক্সটা নিয়ে কেঁদে ফেলল প্রতিমা। কোনমতে নিজেকে সামলে সরে এলেন সতীশ রায়। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে বাইরের চাতালে পেতে রাখা চেয়ারে বসলেন। ঘটকমশাই এগিয়ে এলেন, 'বড়বাবু!'

'অ্যাঁ? হ্যাঁ। চল।' রুমালে চোখ মুছলেন সতীশ রায়।

'যখন সমস্যার একরকম সমাধান হয়েই গেছে তখন—।'

'না। কোনও সমাধান হয়নি।' উঠে দাঁড়ালেন সতীশ রায়। অনিচ্ছুক ঘটকমশাইকে নিয়ে তিনি যখন বাড়ির গেটে পৌঁছে গেছেন তখন শঙ্খধ্বনি ভেসে এল।

এইসময় কালীপদবাবু পেছন থেকে ডাকলেন, 'রায়মশাই, শুনুন।'

সতীশ রায় দাঁড়াতেই তিনি কাছে এসে বললেন, 'একি! আপনি চলে যাচ্ছেন? মেয়েটার বিয়ে দেখবেন না?'

'আমাকে অনুরোধ করবেন না।' মাথা নাড়লেন সতীশ রায়।

'কিন্তু আপনি চলে গেলে প্রতিমা খুব দুঃখ পাবে। ওদিকে ছেলের আশীর্বাদ চলছে। ওকে আশীর্বাদ করবেন না?'

'একজনকে তো করেছি। তাহলেই হবে।' সতীশ রায় বললেন, 'ঘটকবাবু, ড্রাইভারকে বল গাড়ি আনতে।'

ঘটকমশাই বাইরে বেরিয়ে কোথাও ড্রাইভারকে খুঁজে পেলেন না। ফিরে এসে সেকথা জানাতেই একজন বলল,'ও তো এই ব্যাচে খেতে বসেছে।'

'সেকি! খেতে বসে গেল?' সতীশ রায় রেগে গেলেন।

'আহা! ও তো বুঝতে পারেনি চলে যাবেন। দয়া করে ওর খাওয়া শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করুন।' কালীপদবাবুর কথায় মাঝখানেই ভেতরের ছাঁদনাতলায় হই-হই শুরু হল। বোঝা গেল বরকে ছাঁদনাতলায় আনা হয়েছে। পুরুতমশাই কাজ শুরু করেছেন। কালীপদবাবু বললেন, 'আমার উপোস করা নিষেধ। ডাক্তারের বারণ। তাই সম্প্রদান করতে পারছি না। সম্প্রদান করছে মেয়ের মা।'

'মা! তাই নাকি?' অবাক হলেন সতীশ রায়। এই অঞ্চলে মেয়েরা সম্প্রদান করেছেন এমন ঘটনা শুনিনি। কিন্তু এটাই ঠিক। মেয়েকে সম্প্রদানের অধিকার মায়ের চেয়ে আর কার বেশি হবে!'

'তাহলে!'

'আমাকে আর বিব্রত করবেন না।' হাতজোড় করলেন সতীশ রায়।

কালীপদবাবু ফিরে গেলেন। মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর ড্রাইভারের খাওয়া শেষ হল। বড়বাবুকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে জিভ কেটে দৌড়াল গাড়ি নিয়ে আসতে। এইসময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন মেয়ের মা এবং দিদিমা।

মেয়ের মা সতীশ রায়ের সামনে এসে হাত জোড় করলেন, 'আপনি দয়া করে ভেতরে আসুন। আমি প্রতিমার মা, সরমা।'

'স-র-মা!' অবাক হয়ে তাকালেন সতীশ রায়।

'ডুডুয়াতে যখন মায়ের সঙ্গে পোস্টমাস্টার দাদার বাড়িতে গিয়ে কদিন ছিলাম তখন—।' সরমা কথা শেষ করতে পারলেন না।

'মনে পড়েছে। খুব বিরক্ত করতাম বলে আপনার মা আপনাকে নিয়ে সাততাড়াতাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। তখন অল্প বয়স ছিল। চপল ছিলাম।'

'স্বাভাবিক। কিন্তু আজ পরিণত বয়সে আপনি যদি চলে যান তাহলে খুব দুঃখ পাব। ঘটনাচক্রে এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছে যা আপনাকে কেউ বলতে সাহস পাচ্ছে না। আমার অনুরোধ, দয়া করে ভেতরে চলুন।' সরমা বললেন।

অগত্যা রাজি হলেন সতীশ রায়। সরমা দ্রুত চলে গেলেন, তাঁকে সম্প্রদান করতে হবে। কালীপদবাবু বললেন, 'আসুন। মেয়েকে আনা হচ্ছে।'

শেষবার প্রতিবাদ করেছিল প্রতিমা দাদুর কাছে। কিন্তু তিনি নির্বিকার। শেষতক সে রাজি হল একটি শর্তে, বর অপছন্দ হলে সে ফিরে আসবেই।

পিঁড়িতে বসিয়ে তাকে নিয়ে আসা হল। ঘেরাটোপের মধ্যে বর দাঁড়িয়ে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। প্রতিমা পানপাতা দিয়ে ঢেকে রাখতে বাধ্য হয়েছে মুখ। সতীশ রায় এসে বসলেন দর্শকের চেয়ারে।

'শুভদৃষ্টি হোক, তাকাও দুজন দুজনের দিকে।' চেঁচালে দু-একজন।

পানের পাতা মুখ থেকে সরিয়ে সামনে তাকিয়েই প্রতিমা পৃথিবী ভুলে চিৎকার করে উঠল, 'একি! আপনি?'

সত্যচরণ কুঁকড়ে উঠল, 'আমি!'

'আপনি কোত্থেকে উদয় হলেন?' গলা আরও ওপরে উঠল প্রতিমার।

'মালা বদল হোক, মালা বদল হোক।' দাবি উঠল।

সতীশ রায় কালীপদবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে দেখুন তো? শুভদৃষ্টির সময় কোনও কনে এভাবে চিৎকার করে না!'

কালীপদবাবু নিঃশব্দে সরে গেলেন।

বরকে যখন ছাদনাতলার পিঁড়িতে নিয়ে আসা হল তখন সতীশ রায়ের চোখ বিস্ফারিত। এ কাকে দেখছেন তিনি! সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলেন, 'একি! তুমি? তুমি এখানে কী ভাবে এলে?'

ঘোমটা সরিয়ে প্রতিমাও মাথা নাড়ল, 'আমিও তো অবাক।'

সতীশ রায় কালীপদবাবুকে দেখতে না পেয়ে মহাদেব সেনকে বললেন, 'এই রসিকতার অর্থ কি? আমার অজান্তে ছেলেকে এখানে নিয়ে এসে আপনারা এতবড় নাটক করলেন কেন? আমি এখনই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

'দাঁড়ান।' মহাদেব সেনের স্ত্রী এগিয়ে এলেন, 'উত্তেজিত না হয়ে আপনাকে সমস্ত ঘটনা শুনতে হবে। আসুন এদিকে।'

কয়েক মিনিট ধরে ঘটনাটা শুনলেন সতীশ রায়। শুনতে শুনতে তাঁর মনে হচ্ছিল জুতো মেরে ছেলের মুখ ভেঙে দিতে।

ঘটকমশাই পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'বড়বাবু!'

সতীশ রায় জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেললেন ওঁর মুখে। একটু কুঁকড়ে গেলেও ঘটকমশাই বললেন, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। বিয়ে যখন শুরু হয়ে গেছে তখন আপনি যদি বকাবকি করেন তাহলে হিতে বিপরীত হতে পারে।'

'হিতে বিপরীত হবে মানে? বিয়ের পিঁড়ি ছেড়ে উঠে যাবে? দেখি কত হিম্মত! ওর গতজন্মে কিছু ভাল কাজ করেছিল বলে এত কিছুর পরেও বউমা

ওকে বিয়ে করছে। অন্য মেয়ে হলে—!' গজরালেন সতীশ রায়।

'তাহলে ডুডুয়াতে খবর দিই!' ঘটকমশাই অনুমতি চাইলেন।

'কী খবর?' বুঝতে পারলেন না সতীশ রায় অন্যমনস্ক থাকায়।

'বরযাত্রীরা চলে আসুক। এমন কিছু রাত হয়নি। দশটার মধ্যেই এসে যাবে।

'কেন? তুমি আছ, আমি আছি।'

'আপনি বরকর্তা আর আমি ঘটক। ঠিক অর্থে আমরা তো বরযাত্রী নই।'

'দ্যাখো। এখন কাউকে পাবে বলে মনে হয় না।'

কিন্তু পাওয়া গেল। টেলিফোন ধরল নাগেশ্বর, 'হ্যালো।'

'আমি ঘটকমশাই বলছি, আপনি কে বলছেন?'

'আমি নাগেশ্বর। খুব চিন্তায় ছিলাম। ওরা দুর্ব্যবহার করেনি তো?'

'না না। আপনি সবাইকে নিয়ে বরযাত্রী হিসেবে চলে আসুন।'

'অ্যাঁ। সেকি! বরয়াত্রী যাব, তার মানে বিয়ে হচ্ছে?'

'হচ্ছে। দেরি করবেন না।'

লাইন কেটে গেল। রিসিভার হাতে ধরে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে চিৎকার করে উঠল নাগশ্বের, 'ও গোরক্ষ, বরযাত্রীদের খবর দাও, যেতে হবে।'

'যেতে হবে?' গোরক্ষ ঝিমোচ্ছিল। আজ সন্ধ্যায় আহ্নিক হবে না ঠিকই ছিল। তবু। লাফিয়ে উঠল সে, 'বিয়ে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। হচ্ছে।' হাসতে হাসতে মাথা দোলাল গোরক্ষ।

'তার মানে!'

'বুঝতেই পারছ!'

'ওরাই বোধহয় ধরে বেঁধে, ঘটকমশাই-এর সেই গল্পের মতো!'

'আমাদের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন বড়বাবু।'

'এইজন্যেই বলে, ভাগ্যবানের বউ মরে—।'

'আমরা অভাগাই থেকে যাব হে। চল, চল।'

ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। সবাই সাজগোজ করতে লাগল। যারা চলে গিয়েছিল তারা ফেরত এল। হরিপদ ছুটে গিয়েছিল অন্দরমহলে, 'ও মতির মা, বড়বাবু বিয়েতে বসেছেন।'

হঠাৎ মতির মা পালটে গেল, 'ঠিক করেছেন। একটা আইবুড়ো মেয়েকে

রক্ষা করেছেন।' বলে কেঁদে উঠল সে।

এলোকেশী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না!'

'ফোন এসেছিল আর তুমি অবিশ্বাস করলেই হবে।' হরিপদ ধমক দিল।

'বড়বাবুর মতো মানুষ এই কাজ করতেই পারেন না।' এলোকেশীর কথা শেষ হতে না হতে বরযাত্রীদের গাড়ি চোঁ চোঁ দৌড়াল বিয়েবাড়ির উদ্দেশ্যে।

টেলিফোন বাজছে। এলোকেশী দৌড়াল। রিসিভার তুলে সাড়া দিতে ঘটকমশাই-এর গলা শুনতে পেল, 'ডুডুয়ার সতীশ রায়ের বাড়ি?'

এলোকেশী বলল, 'হ্যাঁ।'

'বরযাত্রীরা রওনা হয়ে গেছে?'

এলোকেশী ঢোঁক গিলল। ঘটকমশাই আবার প্রশ্নটা করলেন।

'হ্যাঁ। কে বলছেন?'

'আমি ঘটকমশাই।'

'ও। বিয়ে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। সানাই শুনতে পাচ্ছ না? রাখছি।'

'শুনুন, হ্যালো।'

'হ্যাঁ, বলো।'

'বড়বাবু।'

'খুব ক্ষেপে গেছেন। আমাকে ওঁর পাশে থাকতে হচ্ছে।'

'মানে—?'

'মানে আবার কি? ছেলের ওপর রেগে চণ্ডাল হয়ে আছেন!'

'ছেলে, মানে, খোকাবাবু—!'

'সে ভিজে বেড়ালের মতো বিয়ের পিঁড়িতে বসে মন্ত্র পড়ছে। রাখছি।'

হঠাৎ কান্না এল এলোকেশীর। কেন এই কান্না তা তার অজানা। খুব দ্রুত সেটাকে সামলে নিয়ে সে চিৎকার করল, 'ও মতির মা, ও হরিপদদা।

ওরা ছুটে এল অবাক হয়ে। হেসে ফেলল এলোকেশী, 'খোকাকে পাওয়া গিয়েছে গো।'

মতির মা আঁচলে ঠোঁট চাপা দিল, 'কোথায়?'

'বিয়ের পিঁড়িতে বসে মন্ত্র পড়ছে।'

'আঁ।' হাঁ হয়ে গেল হরিপদ।

ঝকমকিয়ে হেসে উঠল মতির মা, 'সত্যি?'

আরও বেশি হাসল এলোকেশী, 'সত্যি, সত্যি।'

বিয়ে হয়ে গেল। বরবউকে বাসর ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সতীশ রায় উঠলেন। ঘটকমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাবেন বড়বাবু?'

'ওই হারামজাদার ভূত ভাগাব আমি।'

'দয়া করে এখন এই কাজ করবেন না বড়বাবু।' হাতজোড় করল ঘটকমশাই।

'তার মানে? আমার ছেলেকে আমি শাসন করব না?'

'নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু এখানে নয়। এখানে সে বর, তার সম্মান আছে।'

'রাখো। তার সম্মানবোধ থাকলে এরকম করত?'

'তা করত না, হয়তো ভাবেনি এসব। তাছাড়া—।'

'চটপট বলে ফেলো।'

'এখন তো সে শুধু আপনার ছেলে নয়, এ বাড়ির জামাইও।'

'জামাই?' থমকে গেলেন সতীশ রায়।

'এঁদের সামনে জামাইকে অপমান করা কি ঠিক কাজ হবে?'

'হুম্।' সতীশ রায়কে দেখে মনে হল অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন।

কালীপদবাবু এবং সরমা এগিয়ে এলেন। কালীপদবাবু বললেন, 'এবার আপনারা এ-বাড়ির অন্নগ্রহণ করতে চলুন।'

সতীশ রায় বললেন, 'যাও ঘটকবাবু, তুমি খেয়ে নাও। এতরাত্রে খাওয়ার অভ্যেস নেই আমার।'

'তা বললে শুনছি না। মেয়ে দেখতে এসে আপনি বলেছিলেন বিয়ের দিন পেট ভরে মিষ্টি খাবেন।' সরমা বললেন।

কালীপদবাবু বললেন, 'নিয়ম না ভাঙলে সেটা আছে কিনা বোঝা যায় না রায়মশাই। কথায় বলে যার শেষ ভালো তার সব ভালো। আপনাকে অ্যান্টাসিড দিচ্ছি। সেটা খেয়ে নিয়ে খেতে বসুন, হজমের কোনও অসুবিধে হবে না।'

ঘটকমশাই বললেন, 'বড়বাবু আপনি যবনের হাতে পড়েছেন। নিস্তার নেই।'

'বেশ। বরযাত্রীরা আসছে। ওঁরা আসুক।' সতীশ রায় মাথা নাড়লেন।

ঘটকমশাই কালীপদবাবুর সঙ্গে কথা বলতে খাওয়ার জায়গা যেদিকে সেদিকে চলে গেলেন। সম্ভবত এই সুযোগে মেনু যাচাই করা তাঁর ইচ্ছে। মাথার ওপর শ্রীকৃষ্ণ আছেন। একটা বড় দাঁও প্রায় হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল, এবার ঘটকবিদায় নিশ্চয়ই খুব ঘটা করে দেবেন বড়বাবু। আনন্দ হচ্ছে খুব।

সতীশ রায় বললেন, 'একটা কথা বলি, আপনাদের মন খুব বড়। নইলে ওই ছোকরার ন্যাকামি শুনেও বিয়ে দিতেন না।'

হেসে ফেললেন সরমা, 'আশ্চর্য। যে মেয়ের সঙ্গে ও কথা বলেনি, দূর থেকে দেখেছে, সেই মেয়েও ওকে ভালো করে চেনে না তার জন্যে বেচারা ভাবছে মনের কৌমার্য নষ্ট করে বসেছে বলে আর বিয়ে করবে না। আজকের দিনে কোনও ছেলে এরকম ভাবছে কেউ বিশ্বাস করবে?'

'তবে বুঝুন। কী ছেলে নিয়ে আমি বাস করছি। আজকের দিনে কেন, কোনও কালেও কেউ বিশ্বাস করবে না।' সতীশ রায় বললেন।

'ঠিক বলেছেন। সেই যে আমি ডুডুয়ায় গিয়েছিলাম মায়ের সঙ্গে, আপনি তখন তো বাইশ তেইশ বছরের, আমার দিকে একটু বেশি তাকাতেন দূর থেকে। মা সাততাড়াতাড়ি আমাকে নিয়ে ফিরে এল মালবাজারে। তা তখন কি আপনার মনে হয়েছিল যে আপনি মনের কৌমার্য হারিয়েছেন?'

'আমার ঠিক মনে পড়ছে না—।'

'ছেলেদের মনে থাকে না, মেয়েরা ভুলতে পারে না।'

'নভেল আর কবিতা পড়ে পড়ে ওর মাথাটা শেষ হয়ে গেছে।'

'মেয়েটি কে?'

'কোন্ মেয়ে?'

'যার জন্যে ওর মনের কৌমার্য গেছে।' হাসলেন সরমা।

'ও নাম বলেনি?'

'না।'

'ডুডুয়ার পোস্টমাস্টারের মেয়ে। রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে কেউ দ্যাখেনি। পোস্টমাস্টার কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তার বিয়ে দিল। কিন্তু এমনই কপাল কয়েকদিনের মধ্যেই বিধবা হয়ে ফিরে এল মেয়েটা।'

'ইস!'

এইসময় মহাদেববাবুর স্ত্রী এসে বললেন, 'তুই সারাদিন উপোস করে আছিস। এখন একটু মিষ্টি আর শরবত খেয়ে নিবি চল্।'

'দাঁড়াও। আগে বেয়াইমশাই খেতে বসুন, তারপর।'

'না না। আপনি উপোস করে আছেন।' তারপরেই মনে আসতে সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, উপোস করার কী খুব দরকার ছিল?'

সরমা মাথা নাড়লেন, 'সন্তানের মঙ্গলের জন্যে উপোস করে প্রার্থনা করতে মনে তৃপ্তি আসে। এটুকু তো কম প্রাপ্তি নয়?'

বরযাত্রীরা এসে গেল। নাগেশ্বর এবং গোরক্ষ ঘটকমশাইকে দেখতে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বড়বাবু কি এখন বাসরঘরে?'

'অ্যাঁ? একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?' ঘটকমশাই অবাক।

'বাঃ। আপনি ফোনে বললেন বিয়ে হচ্ছে।' নাগেশ্বর সন্দেহের চোখে তাকাল।

'হ্যাঁ। কিন্তু বড়বাবু বিয়ে করছেন একথা বলিনি।'

'তাহলে?'

'যার বিয়ে করার কথা ছিল সে-ই করছে।'

'সেকি?'

কালীপদবাবুরা বরযাত্রীদের আপ্যায়ন শুরু করায় ঘটকমশাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বরযাত্রীদের খেতে বসিয়ে দেওয়া হল। সতীশ রায় বসলেন না। তিনি একবার খাওয়ার জায়গায় এলেন, 'নাগেশ্বর, গোরক্ষ, বেশ রাত হয়ে গেছে, গলা পর্যন্ত খেয়ো না।'

'তা খাবো না।' নাগেশ্বর বলল, 'কিন্তু বড়বাবু, খোকাকে কোথায় পেলেন?'

'আমি পাইনি।' সতীশ রায় দাঁড়ালেন না।

নাগেশ্বর অবাক হয়ে পাশে বসা গোরক্ষর দিকে তাকাল। খাওয়া বন্ধ করে হতভম্ব গোরক্ষ তখন বড়বাবুর চলে যাওয়া দেখছে।

※

সরমার অনুরোধে সতীশ রায় গোটা দুয়েক মিষ্টি খেলেন আলাদা বসে। তারপর বললেন, 'আমার বাড়িতে বউভাতে আপনারা পায়ের ধুলো দিলে খুব খুশি হব। সবাই যেন আসেন।'

সরমা বললেন, 'নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু আমি দুটো মিষ্টি ছাড়া আর কিছু খাব না। জোর করবেন না বলে রাখলাম।'

'কেন?'

'ছেলের বাপ যা আচরণ করছেন মেয়ের মায়ের তাই করা উচিত।'

হেসে ফেললেন সতীশ রায়, 'বিশ্বাস করুন, দীর্ঘকালের অভ্যেস। রাত নটায় খেতে বসি। দশটা বেজে গেলে খাই না। কষ্ট হয়। এবার উঠি।'

মহাদেব সেন বললেন, 'বরকনের সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?'

'বাসরঘরে সবাই আনন্দ করছে, কী দরকার বিরক্ত করার। হ্যাঁ, কাল কখন ওরা রওনা হচ্ছে?'

'বাসি বিয়ে হয়ে গেলেই। ধরুন, সকাল দশটায়।' কালীপদবাবু বললেন।

'তাহলে বারোটায় পৌঁছাবে। ভরদুপুরে। তার চেয়ে খেয়েদেয়ে যদি তিনটে নাগাদ রওনা হয়! অবশ্য বারবেলা যদি পড়ে না যায়!'

ঠিক হল, পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলে ওঁরা আগেভাগে জানিয়ে দেবেন। বরযাত্রীদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। নাগেশ্বর গোরক্ষ তাদের সঙ্গে বরকনেকে দেখে এসেছে বাসরঘরে গিয়ে। কনে তার বান্ধবীদের কথায় খুব হাসছিল। বেশ সুন্দরী দেখাচ্ছিল তাকে। পাশে বসা বরকে বরং বেশ বিমর্ষ বলে মনে হল। মাথা নিচু করে বসে আছে। যেন তার ওসব ভালো লাগছে না।

বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন সতীশ রায়। সঙ্গে সঙ্গে মানিকজোড় ঘটকমশাইকে অন্য গাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল। সতীশ রায় কিছু বললেন না।

গাড়ি চলতে শুরু করলে গোরক্ষ বলল, 'দেখে দু-চোখ জুড়িয়ে গেল বড়বাবু।'

'কী দেখে? পেছনের আসনে হেলান দিয়ে বসা সতীশ রায় প্রশ্ন করলেন।

'নতুন বউকে।'

'ও।'

'আপনার বাড়ি আলোয় ভরে যাবে।'

'এখন অন্ধকারে ডুবে আছে বলছ?'

'না-না মানে—!'

'ঠিক আছে।'

গোরক্ষ আর কথা খুঁজে পেল না। নাগেশ্বর বলল, 'খোকা তাহলে আজ শিলিগুড়িতে যায়নি। নিশ্চয়ই ভেবেছিল বিয়ে বাড়িতে না এলে আপনার অসম্মান হবে।'

সতীশ রায়ের ইচ্ছে করছিল না কথা বলতে। কিন্তু এই দুজনের কৌতূহল

না মেটানো পর্যন্ত এরা কথা বলেই যাবে। তাই সংক্ষেপে ঘটনাটা বললেন।

'কেউ চিনতে পারেনি?' গোরক্ষ অবাক।

'চিনলে তো বেঁধে রাখতো না। যাঁরা চিনতেন তাঁরা ওর আসার কথা জানতেন না। অবশ্য শুধু বেঁধে রাখা নয় ওকে যদি মারধোর করতো খুশি হতাম।'

'দেখবেন, বিয়ের পর বদলে যাবে।' গোরক্ষ বলল।

সতীশ রায় কিছু বললেন না।

বিকেল সাড়ে চারটের সময় সত্যচরণ তার নতুন বউকে নিয়ে বাড়ি ফিরল। নাগেশ্বর এবং গোরক্ষর বউ নতুন বউকে বরণ করে ভেতরে নিয়ে এল। সতীশ রায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে প্রতিমা দাঁড়াল। তারপর কাছে গিয়ে নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিল। মাথায় হাত রাখলেন সতীশ রায়, 'তোমার ওপর খুব ভরসা করে আছি মা।'

ছোট্ট শব্দটি ঘোমটার আড়াল থেকে ভেসে এল, 'জানি।'

মতির মা বা এলোকেশী তো বটেই, নাগেশ্বররাও অনুরোধ করেছিল সত্যচরণকে বউভাতের আগে বকাঝকা না করতে। ছেলেকে দেখে তাই মুখ সরিয়ে নিলেন সতীশ রায়। সত্যচরণ ভেতরে চলে গেল।

আজ কালরাত্রি। সত্যচরণের ঘরটিকে সকাল থেকে সাজিয়েছে এলোকেশীরা। সেখানেই প্রতিমাকে নিয়ে যাওয়া হল। এলোকেশী বলল, 'কাল অবধি এটা তোমার বরের ঘর ছিল। আজ থেকে তোমার।'

প্রতিমা অবাক হল, 'তা হয় নাকি? ওর ঘর আমার হবে কেন? এ বাড়িতে আর কোনও খালি ঘর নেই?'

'তা থাকবে না কেন? কিন্তু তোমরা দুজন তো এই ঘরেই থাকবে!'

'আমরা তো সেই ঘরেই থাকতে পারি!' হাসল প্রতিমা।

অতএব আর একটি খালি ঘরে খাট পাতা হল। সেখানে গিয়ে প্রতিমা বলল,'বাঃ। চমৎকার। আমার জিনিসপত্র এখানে এনে দাও, আমি জামাকাপড় পালটাবো।'

এলোকেশীর সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল প্রতিমার। তার মুখেই বিবাহবৃত্তান্ত শুনল এলোকেশী। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এসব শুনেও তুমি বিয়ে করতে

রাজি হলে?'

'আমাকে তো কেউ এসব আগে বলেনি। শুভদৃষ্টির সময় দেখতে পেলাম। তখন কি করে ছাঁদনাতলা ছেড়ে বেরিয়ে আসি বল।' প্রতিমা ঠোঁট ফোলাল।

'তা ঠিক। পরে, মানে বাসরে ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করোনি?'

'চান্সই পাইনি। ফাঁসির আসামির মতো মুখ করে বসেছিল। রাত্রের খাওয়া শেষ করেই এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়ল যে মা বলল, আহা বেচারা। ঘুমাচ্ছে ঘুমাতে দে।' প্রতিমা বলল, 'কী যে করি!'

'তার মানে?'

'সত্যি বলতো এলোদি, কেউ যদি মনে মনে কাউকে ভালোবাসে তাহলে তার মন থেকে কি ভালোবাসা উড়িয়ে দেওয়া যায় না দেওয়া উচিত?'

'তুমি ওর মনে ওই ভালোবাসা থাকতে দেবে?' চোখ বড় করল এলোকেশী।

'তাই তো দেওয়া উচিত!' মাথা ঝাঁকাল প্রতিমা।

'অ্যাঁ! তুমিও কি পাগল?'

'আমি কেন পাগল হব?' প্রতিবাদ করল প্রতিমা।

'সেই মেয়ের বিয়ে হয়েছিল, বিয়ের পর বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছে। খোকাকে সে ভালো করে চেনেই না, কথাও হয়নি কোনদিন।'

'হুঁ!'

'হুঁ কী?'

'একেবারে মীরার মতো ব্যাপার, না?'

'মীরা? কে মীরা?'

'ওঃ। তুমি মীরার নাম শোননি? কৃষ্ণের মূর্তির সামনে বসে ভজন গাইতেন। কৃষ্ণ ওঁকে কোনদিন দ্যাখেননি, কথাও বলা দূরের কথা, তবু মীরা প্রেমিক বা স্বামী ছাড়া কিছুই ভাবতে পারতেন না।

দশ মিনিট পরে মতির মাকে নির্জনে পেয়ে এলোকেশী বলল, 'কী হবে গো! এ দেখছি, যেমন দেবা তেমনি দেবী।'

মতির মা মাথা নাড়ল, 'না না। মেয়েটা খুব ভালো। নইলে খোকাবাবুকে তার ঘর ছেড়ে দেয়?'

এলোকেশী মতির মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

মতির মা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'কী মিল তোমাদের মধ্যে।' এলোকেশী হাসল।

নিজের ঘরটাকে অন্যরকম দেখে বেশ রেগে গেল সত্যচরণ। তার টেবিলের কাগজপত্র উধাও। ছড়ানো ছেটানো বইগুলো একপাশে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আলনাটা খালি। তার মানে জামাকাপড় আলমারিতে ঢুকিয়ে রেখেছে। আর এসব কীর্তি যে এলোকেশীর তাতে তার কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু রাগ গিলতে হল। গতকালের ঘটনার পর বাবা তাকে একটাও কুবাক্য বলেননি। ওরা তাকে শুধু বেঁধে রেখেছিল, বাবা হাতে পেলে জুতো ছিঁড়তেন মারতে মারতে। অথচ একটা সরল সত্য সে কাউকে বোঝাতে পারছে না। টিয়া যাই বলুক, তার হৃদয়ে শুধু ওরই মুখ। তাহলে তার মনের কৌমার্য নেই। সেক্ষেত্রে এই মন অন্য কাউকে দেওয়া মানে অসৎ হওয়া। যতদিন না তার হৃদয় থেকে টিয়ার মুখ মুছে না যায় ততদিন সে কাউকে হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারবে না। তার আবেগকে কেড়ে নিতে সে কিছুতেই দেবে না। হঠাৎই কবিতার লাইন মাথায় এসে গেল সত্যচরণের। কাগজ খুঁজল সে। চোখের সামনে কোন কাগজ নেই। না থাক। মনে মনে লাইন ভাবল সত্যচরণ, 'তুমি ডানা মেলতেই এই বুক সবুজে ছেয়ে যায়।' পরের লাইনটা মাথায় আসছিল না।

সন্ধেবেলায় নাগেশ্বররা এল। কাল বউভাত। ম্যারাপ বাঁধা হয়ে গেছে বাড়ির সামনে। ঠাকুররা রান্নার আয়োজন করছে। যদিও মূল রান্না শুরু হবে কাল সকাল থেকে। ডুডুয়ায় বউভাত মানে দুপুরের খাওয়া। বেলা সাড়ে এগারোটা থেকেই অতিথিরা এসে যাবেন। গোরক্ষ রান্নার তদারকিতে ছিল। নাগেশ্বর আপ্যায়নে।

একটু হালকা হলে ওরা সতীশ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখল ডুডুয়ার কয়েকজন বয়স্ক মানুষ ওঁর সঙ্গে কথা বলছেন।

সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু বলবে?'

নাগেশ্বর জিজ্ঞাসা করল, 'আজ কি সন্ধের পরে বেরুবেন?'

'কোথায়?' সতীশ রায় বুঝতে পারলেন না।

'গাড়ি নিয়ে।' গোরক্ষ বাক্য শেষ করল না।

'নাঃ।'

'ঠিক আছে।' গোরক্ষরা সরে এল।

নাগেশ্বর বলল, 'আজ কালরাত্রি, কাল ফুলশয্যা। গতকাল বিয়ে গেল। পরপর তিন রাত্রি উপোস।'

'বড়বাবুরও কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু লোকলজ্জা বলে একটা কথা তো আছে।'

'হুঁ। তাহলে ধরে নিই এটা আমাদের পরীক্ষা।'

'তাছাড়া উপায় নেই।'

লোকজন চলে এলে নিজের ঘরে এসে হরিপদকে ডাকলেন সতীশ রায়। হরিপদ এলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বউমা কী করেছে এখন?'

'আজ্ঞে, বসে আছে।' হরিপদ বলল।

'একা?'

'হ্যাঁ।'

'সে কোথায়?'

'তার ঘরে।'

'বউমাকে এখানে আসতে বল।'

হরিপদ চলে গেল। একটু পরেই প্রতিমা ঘরে এল। এখন তার আটপৌরে সাজ। বলল, 'আমাকে ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ। বসো।'

প্রতিমা বসল।

'খুব মন খারাপ করছে নিশ্চয়ই!'

প্রতিমা মুখ নামাল।

'মেয়েদের এটা সইতেই হয়। তবে কদিন বাদেই তো মায়ের কাছে যাবে। আগামিকালও তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে তোমার। বেশিদূরের পথ তো নয়। গাড়ি আছে, যখন দেখতে ইচ্ছে করবে চলে যাবে।' সতীশ রায় বলল।

'ঠিক আছে।'

'তোমার সঙ্গে খোকার কথা হয়েছে?'

'কী কথা?'

'মানে, এমনি কথাবার্তা?'

'না।'

'কী লজ্জায় ফেলে দিয়েছিল বল তো। শুধু আমাকে নয়, তোমাকেও। অতএব একটা ছেলে যে এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন হবে ভাবতে পারিনি।'

প্রতিমা বলল,'আপনি এ নিয়ে আর ভাববেন না।'

সতীশ রায় বউমার দিকে তাকালেন। এই মেয়ে বুদ্ধিমতী। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে দেখতে গিয়ে শুধু একটি প্রশ্ন করেছিলাম, পাঁচটা গালাগালি শুনতে চেয়েছিলাম। তোমার মনে হয়নি কেন এরকম উদ্ভট প্রশ্ন করেছিলাম?'

'আপনি বোধহয় আমাকে যাচাই করতে চেয়েছিলেন। বিশ্বাস করুন, বিয়ের পিঁড়িতে বসা ইস্তক ওই পাঁচটা, না না, ছটা গালাগালি কেবলই মনে আসছিল।'

'কতক্ষণ?'

'এই বাড়িতে ঢোকা পর্যন্ত।'

'তারপর?'

'তারপর আর আসছে না।'

'তোমার সঙ্গে সে কথা বলেছে তো?'

'একটাও না। এই যে এতক্ষণ গাড়িতে পাশে বসে এল, যেন কোনও সাড় ছিল না। আমিও তাই একটাও কথা বলিনি।' প্রতিমা মাথা নাড়ল।

'না মা। তুমি কথা না বললে ও খুশি হবে। নিজের মতো থাকতে পারবে। তুমি তাই কথা বলবে। মাটির কলসির ঘষা লেগে পাথরও ক্ষয়ে যায়, ও তো মানুষ। তুমি ঠিক পারবে ওকে সচল করতে।' সতীশ রায় বললেন, 'যাও, বিশ্রাম নাও। এ বাড়িতে কোনও অসুবিধে হলেই আমাকে নিঃসংকোচে জানাবে।'

প্রতিমা উঠে দাঁড়াল। এক পা দরজার দিকে এগিয়ে থেমে গেল। তারপর সবিনয়ে বলল, 'শ্বশুরবাবা!'

'শ্বশুরবাবা?' সতীশ রায় অবাক।

'আমার তো বাবা ছিল। বাবা বললেই তাঁর কথা মনে পড়ে। তাই—।'

'ঠিক আছে। শ্বশুরবাবাই বলবে। হ্যাঁ, বলো।'

'আমি এ বাড়িতে আসায় আপনি—।' আবার চুপ করে গেল প্রতিমা।'

'আচ্ছা বল, নিঃসংকোচে বল।'

'না, হরিপদদা বলছিলেন আপনি রোজ বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ম করে আহ্নিক করেন এই সময়, আমি আসায় সেটা বন্ধ করেছেন!'

'ওঃ। হরিপদ একথা তোমাকে বলেছে! দেখেছ, হতভাগা ঠিক নালিশের জায়গা পেয়ে গেছে। আসলে সারাদিনের পরে একটু গল্পগুজব, সেই সঙ্গে দুপাত্র

খেলে রাতের ঘুমটা ভালো আসে। আমি কখনই সীমা অতিক্রম করি না। হরিপদ নিশ্চয়ই বলেছে আমি কখন রাতের খাওয়া খাই!'

'হ্যাঁ। আপনি যেমন ছিলেন তেমন থাকলে আমার ভালো লাগবে।'

'বেশ তো। আজ আমার খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। ক্ষিদেও পেয়েছে। বউভাত চুকে যাক, তারপর দেখা যাবে।' হাসতে হাসতে বললেন সতীশ রায়।

সকাল থেকে খুব ধকল গেল। প্রথমে বউকে দিয়ে আত্মীয়স্বজন, ঘনিষ্ঠদের ভাত পরিবেশন করানো হল। সত্যচরণকেও সেই পঙক্তিতে বসতে হল। এলোকেশী লক্ষ করল সত্যচরণের পাতে প্রতিমা বেশ বেশি বেশি ভাত তরকারি ঢেলে দিল। তারপরেই সতীশ রায় বললেন, 'এবার ওকে রেহাই দাও। আর কষ্ট করতে হবে না।' সত্যচরণের পক্ষে ওই পরিমাণ ভাত খাওয়া অসম্ভব। তাই খাওয়া শেষ হলে সবাই যখন উঠে যাচ্ছে তখন সতীশ রায়ের নজর গেল ছেলের পাতের দিকে, 'ওকি! তুমি অত ভাত ফেলে রেখেছ? না খেতে পারলে দেওয়ার সময়ে আপত্তি করোনি কেন? অদ্ভুত।'

এলোকেশীই সাজিয়ে দিল। বেনারসী, চন্দন এবং ফুলের মালায় প্রতিমাকে জীবন্ত মনে হচ্ছিল। ফুলশয্যার ঘর ফুল দিয়ে ভরিয়ে রাখা হয়েছে সন্ধে থেকেই। সাধারণত কনে আগে ঘরে ঢোকে, বর তার পরে। কিন্তু খাওয়াদাওয়ার পরে সত্যচরণ আগেই ঘরে ঢুকে বসে আছে। প্রতিমাকে নিয়ে সেই ঘরে গিয়ে এলোকেশী বলল, 'তোমার বউকে দিয়ে গেলাম সারাজীবন যত্নে রাখবে।' বলে হেসে বেরিয়ে গিয়ে দরজা ভেজাতে ভেজাতে বলল, 'ভেতরের ছিটকিনি তুলে দাও।'

চেয়ারে বসেছিল সত্যচরণ। মুখ নিচু করে। প্রতিমা তার দিকে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে খাটের একপ্রান্তে গিয়ে বসল।

সত্যচরণ তার দিকে তাকাচ্ছে না। মিনিট তিনেক পরে প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি রাগ করেছ?'

সত্যচরণ নীরবে মাথা নেড়ে না বলল।

'কাকা চিনতে না পেরে ভয় পেয়ে তোমাকে শাস্তি দিয়েছিল।'

সত্যচরণ কথা বলল না।

'তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলবে না?'

সত্যচরণ কথা বলল। প্রতিমার দিকে না তাকিয়ে বলল, 'কথা বলতেই তো গিয়েছিলাম। সুযোগই পেলাম না।'

'এখন বল। আমি মন দিয়ে শুনব।' প্রতিমা হাসল শব্দ করে।

'হাসির কথা নয়।' মুখ না ফিরিয়ে বলল সত্যচরণ।

'বেশ। তাহলে হাসব না।'

'তুমি কীভাবে নেবে জানি না। সবাই আমাকে ভুল বোঝে। তুমিও নিশ্চয়ই তাই বুঝবে। কিন্তু এই অন্যায় আমি করতে চাইনি। আমাকে জোর করে করানো হয়েছে। প্রতিমুহূর্তে আমি তাই জ্বলে পুড়ে মরছি।' শ্বাস ফেলল সত্যচরণ।

'কী অন্যায়?'

'আমি অসৎ হয়ে গেলাম।'

'কীরকম?'

'আমার এই মনের কৌমার্য অনেকদিন আগে চলে গেছে। এই অবস্থায় তোমাকে বিয়ে করা মানে অসৎ হওয়া।' সত্যচরণ বলল।

'মনের কৌমার্য! তার মানে?'

'মানে, আমার মন আর আমার নেই।' বিমর্ষমুখে বলল সত্যচরণ।

'কোথায় গেছে?'

সত্যচরণ এবার ঘুরে বসল। তার চোখ ছলছল করছে, 'একজন আমার মন জয় করে নিয়েছে। আমার কিছু করার ছিল না।'

'সে কোথায় থাকে?'

'এখানেই। এই ডুডুয়ায়।'

'ও। তাকে বিয়ে করলে না কেন?'

'কী করে করব? তার আগেই তো ওর বিয়ে হয়ে গেল।'

'বিয়ে হয়ে গেল? তোমরা মেনে নিলে?' অবাক হল প্রতিমা।

'না মেনে কী করব? ওর সঙ্গে তো কথাই হয়নি আমার।'

'কথা হয়নি? তোমাদের আলাপ ছিল না?' হাঁ হয়ে গেল প্রতিমা।

'না। আমি ওকে দেখেছি। দেখে মন দিয়ে দিয়েছি। ও আমাকে তো দ্যাখেনি। কথা বলাও হয়নি। এতদিন পরে ও যখন বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে এল তখন কথা বললাম।'

'বিয়ে হল, বিধবাও হয়ে গেল।'

'হুঁ। একেই বলে দুর্ভাগ্য।'

'অ। কী কথা হল?'

'সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলাম। তা আমার সঙ্গে ভালো ভাবে কথাই বলল না। না বলুক, কিন্তু, আমি যে কী করি!'

প্রতিমা হাসল, 'তোমার সমস্যা নিয়ে এখন থেকে তুমি একা ভাববে না। আমিও ভাবব।'

'তুমিও ভাববে?' অবাক হল সত্যচরণ।

'নিশ্চয়ই। আমি তোমার সহধর্মিণী, তোমার পাশে দাঁড়ানো যে আমার ধর্ম। কটা দিন যাক। আমি গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করব।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ। আচ্ছা, ওর নাম কী?'

'পাখি?'

'কী মিষ্টি নাম!'

'তোমার রাগ হচ্ছে না?'

'ওমা। রাগ হবে কেন?'

'আমার মনের কৌমার্য নেই শুনেও রাগ হচ্ছে না?'

'যা গেছে তা নিয়ে ভেবে কী লাভ। আমার দিদিমা তো শিবপুজো করে, নারায়ণ পুজো করে, কালীপুজো করে, লক্ষ্মীপুজো করে। এক এক পুজোর সময় এক এক মন্ত্র পড়ে। একটা মনে অতগুলো দেবদেবীর জায়গা দেওয়া কি অসৎ ব্যাপার নয়?' ভালো করে বিছানায় বসল প্রতিমা।

ফ্যালফ্যাল করে তাকাল সত্যচরণ। তার মাথায় কিছু ঢুকছিল না।

প্রতিমা বলল, 'তা পাখিকে দেখার আগে আর কাউকে দেখে মন দিতে ইচ্ছে করেনি?'

'না। এখানকার অন্য মেয়েরা কেমন যেন। বোন বোন দেখতে।'

শব্দ করে হেসে ফেলে মুখে হাত চাপল প্রতিমা, 'ওমা। এ কী কথা! বোন বোন মানে কী রকম?'

'মানে, দেখলে মনে আবেগ আসে না!'

'ও।' প্রতিমা চোখ ঘোরাল?, 'আমাকে দেখে কী মনে হয়?'

তাকাল সত্যচরণ। তারপর মুখ নিচু করে বলল, 'ভালো।'

'হুম। শোন, আমার ঘুম পেয়েছে।' প্রতিমা বলল।

'ও।'

'ও মানে? আমি শুয়ে পড়ছি। তুমি ঘুমোবে না?' প্রতিমা বলল, 'এসো শুয়ে পড়।' দ্বিতীয় বালিশটাকে বেশ কিছুটা দূরে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'ওইখানে ঘুমোবে। ঘুমের ঘোরে আমি পা ছুঁড়ি, কাছে থাকলে তোমাকে লাথি মেরে বসব। এসো।'

সত্যচরণ উঠল। জামা খুলতে গিয়েও খুলল না। সন্তর্পণে অনেকটা দূরত্ব রেখে শুয়ে পড়ল সে। ওদের দুজনের মাঝখানে একটা লম্বা পাশবালিশ।

প্রতিমা বালিশে মাথা রেখে বলল, 'তুমি চিন্তা কোরো না। আমি পাখির সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে বলব।'

'তুমি পাখির সঙ্গে দেখা করবে?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করল সত্যচরণ।

'যাকে দেখে তোমার মনের কৌমার্য চলে গেছে তাকে দেখতে যে খুব ইচ্ছে করছে। নিশ্চয়ই আমার চেয়ে খুব সুন্দরী। এখন বুঝতে পারছি।'

'কী বুঝতে পারছ?'

'ওই যে কথা আছে না, অতিবড় সুন্দরী না পায় বর, তাই বেচারা বিধবা হল। ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে ওর আগে কথাবার্তা হয়নি।'

'তার মানে?'

উঠে বসল প্রতিমা।

'তার মানে বুঝতে পারছ না। তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে হলেও তো ওকে বিধবা হতে হত। একমাত্র ছেলে মরে গেলে শ্বশুরবাবা তো পাগল হয়ে যেতেন! মতির মা-ও আত্মহত্যা করত। এই বাড়িটা পোড়ো বাড়ি হয়ে যেত। ভেবে দ্যাখো, তুমি এখন পৃথিবীতে নেই, তোমার কেমন লাগছে?'

সত্যচরণ কোনও কথা বলতে পারল না। ব্যাপারটা ভাবতেই বুকের ভেতর শিরশির করে উঠল। কথা বলার চেষ্টা করতে মুখ থেকে মিনমিনে আওয়াজ বেরুল।

প্রতিমা বিরক্ত হল, 'আঃ। তুমি এত মেনিমুখো কেন? কথা বল।'

সত্যচরণ কোনওমতে উচ্চারণ করল, 'তাহলে অন্তত মনের কৌমার্য হারিয়ে যাবার আদেশে এই বিয়েটা তো করতে হত না। পবিত্র থাকতাম।'

'একেই বলে মাকাল।'

'মানে?'

'মাকাল ফল দ্যাখোনি? বাইরে টুকটুকে লাল, কী সুন্দর। ভেতরটা জঘন্য।

পবিত্র থাকার সাধ হয়েছে, মরে গেলে সেটা বুঝতে কী করে?'

'তা অবশ্য—।'

প্রতিমা আবার শুয়ে পড়ল। পাশবালিশের ওপাশে সত্যচরণ বেশ শব্দ করে শ্বাস ফেলল।

'ঘুম আসছে না তোমার?' জিজ্ঞাসা করল প্রতিমা।

'না।' জবাব এল সত্যচরণের।

'আলো নিভিয়ে দেব?'

'আমি ঘুমিয়ে পড়লে দিয়ো।'

'কখন তুমি ঘুমাবে তার জন্যে আমি জেগে থাকব?'

'তাহলে দাও।'

বেড সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল প্রতিমা। তারপর খেয়াল হতে অন্ধকারেই বিছানা থেকে নেমে দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে এল। বিছানায় শোওয়ার পর আবার সত্যচরণের শ্বাস ফেলার শব্দ কানে এল তার।

'কী হল? বুকে কষ্ট হচ্ছে?'

'হুঁ।'

'ঘরে মুভ মলম আছে?'

'আছে। টেবিলের ড্রয়ারে।'

'ওটা বের করে বুকে মালিশ করো, ব্যথা কমে যাবে।'

'না থাক।'

'থাকবে কেন? ব্যথা হচ্ছে বলছ।'

'এ ব্যথা সে-ব্যথা নয়।'

'কী ব্যথা?'

'মরে গেছি ভাবলেই বুকের ভেতরটা টাটিয়ে উঠছে।'

'এদিকে এসো।'

'অ্যাঁ?'

'আমি মেয়েমানুষ হয়ে বলছি এদিকে এসো, আর তুমি বলছ, অ্যাঁ?'

অন্ধকারে সত্যচরণ শরীরটাকে নাড়াচাড়া করতেই পাশবালিশে বাধা পেল।

সে বলল, 'পাশবালিশ আছে যে, এটা কোথায় রাখব?'

অন্ধকারে শব্দটা বুলেটের মতো ছুটে এল, 'ঢ্যামনা।'

ফুটো হওয়া বেলুনের বাতাসের মতো গলা হয়ে গেল সত্যচরণের, 'সেকি!'

'ঠিক বলেছি। শ্বশুরবাবা কেন আমাকে মাত্র একটা প্রশ্ন করেছিলেন তা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। চাদর আর বালিশ নিয়ে নিচে নেমে মেঝের ওপর শুয়ে পড়। আমাকে আর জ্বালিয়ো না। এবার সত্যি ঘুম পাচ্ছে।' পাশবালিশ জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করল প্রতিমা।

মেঝেতে শুলে মাটি থেকে চুঁইয়ে উঠে আসা ঠাণ্ডা বুকে বসে যাবে। নিমোনিয়া হবে। নিমোনিয়া হওয়ায় তাদের স্কুলের একটা ছেলে মারা গিয়েছিল। সেও মরে যেতে পারে। মরে গেলে তো প্রতিমা বিধবা হবে। তখন ওর অবস্থা হবে পাখির মতো। জেনেশুনে কাউকে বিধবা করা তো মহাপাপ।

চুপচাপ বসে থাকল সত্যচরণ। একটু পরে মৃদু ঢুলুনি এল। ততক্ষণে প্রতিমা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে। একসময় পাশবালিশটাকে নিয়ে উলটোদিকে মুখ ফিরিয়ে শুলো।

আর বসে থাকতে পারছিল না সত্যচরণ। প্রতিমা যখন ওইরকম গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছে তখন নিশ্চয়ই টের পাবে না সে নিচে নেমে শুয়েছে কিনা! পায়ের দিকে বালিশ রেখে পা গুটিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল সে। শোওয়া মাত্র ঘুম জাঁকিয়ে বসল তার ওপর।

কতক্ষণ পরে জানা নেই। চাপা আর্তনাদ করে সত্যচরণ হুড়মুড়িয়ে উঠে বসল। তার বুকের ওপর আঘাতটা লেগেছে। প্রতিমার পা পেনাল্টি কিক করেছে তার বুকের ওপর। টাটিয়ে যাচ্ছে পাঁজরা। সেই চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল প্রতিমার, 'কী হল?'

'তু-তুমি, তুমি আমার বুকে ল্যাথি মেরেছ!' করুণ গলা সত্যচরণের।

'অ্যাঁ! তুমি নিচে নেমে শোওনি?'

'না। নিমোনিয়ার ভয়ে এদিকে গুটিয়ে শুয়েছিলাম।'

উঠে বসল প্রতিমা, 'তোমাকে তখন বলেছিলাম ঘুমের ঘোরে আমি পা ছুঁড়ি, সেটা তোমার কানে ঢোকেনি?'

'মনে ছিল না।'

'ওঠো। উঠে দাঁড়াও।' ধমকাল প্রতিমা।

'হ্যাঁ। সোজা হয়ে দাঁড়াও।'

অতএব বুকে হাত চেপে সত্যচরণ উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। প্রতিমা 'নিল

ডাউন' হয়ে বসে তার দুই পায়ে হাত ছোঁয়াল, 'স্বামীর গায়ে পা লাগলে পাপ হয়।' তারপর সেই হাত বুকে মাথায় ছোঁয়াল।

থরথর করে কাঁপছিল সত্যচরণ। জীবনে এই প্রথম কেউ তাকে প্রণাম করল। প্রতিমা জিজ্ঞাসার করল, 'কী হল? এখনও বুকে ব্যথা লাগছে?'

'না না। ব্যথা একটুও নেই। আর মনে হচ্ছে আমি অপবিত্র নই, মনের কৌমার্য চলে যায়নি।'

প্রতিমা বলল, 'তাহলে এই খাটে আমার পাশেই শুয়ে পড়।' বালিশে মাথা রেখে নিঃশব্দে হেসে উঠল সে, মনে মনে বলল, 'ঢ্যামনা।'